

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক)

এম এ কাউসার
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস প্রকাশনীটি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস নথি প্রকাশনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রকাশনীটি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস প্রকাশনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস প্রকাশনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রকাশনীটি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস প্রকাশনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* দুই খণ্ডে বিভক্ত বাইবেলের প্রথম খণ্ডকে বলা হয় ওল্ড টেস্টামেন্ট বা পুরাতন নিয়ম। অধিকাংশ পতিঃদের মতে খ্রিঃ পঃঃ একাদশ শতাব্দী হতে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে ওল্ড টেস্টামেন্ট রচিত ও সংকলিত হয়। অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেই ওল্ড টেস্টামেন্ট রচিত ও সংকলিত হয়েছিল এবং তা সমসাময়িক লোকদের নিকট অভ্যন্ত পরিচিত বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল। ইছদিদের মতে ওল্ড টেস্টামেন্ট তাদেরকে দ্বিতীয় স্বরূপ জনতে ও তাঁর ভালবাসা বুঝতে সাহায্য করে। এই ওল্ড টেস্টামেন্টই হচ্ছে ইছদিদের বাইবেল। লোকদের শিক্ষাদানের সময় যীশু নিজেও প্রায়ই ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করতেন। যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর সম্পর্কে লেখেন। যীশুর পৃথিবীতে আসার কারণ, তাঁর শিষ্য, তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাঁর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর তাঁর মুন্নরূপান্বয় প্রভৃতি নিয়ে। শিষ্যদের এই লেখাগুলোর সংকলনই নিউ টেস্টামেন্ট। যীশুর অনুসারীদের নিকট নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্টের মতোই পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের সম্মিলিত রূপই হচ্ছে বাইবেল।

আব্রাহাম ও ইহুদি ধর্মতের উত্তর

যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে কেনানাইটরা ফিলিস্তিনে প্রথম বসতি স্থাপন করে। কেনানাইটরা ছিল নোয়ার (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিকট নৃহ আঃ) পৌত্র কেনানের বংশধর। কেনানের নামানুসারেই ফিলিস্তিনের প্রাচীন নাম হয় কেনান। খ্রিস্ট পূর্ব উনিশ শতকে ইহুদিদের পূর্বপূরুষ আব্রাহাম (ইব্রাহীম আঃ) ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করেন। আব্রাহামের আদি নিবাস ছিল তৎকালীন প্রসিদ্ধ ক্যালডিশীয় উর নগরে (সুমেরীয় সম্রাজ্যের রাজধানী)। বর্তমান ইরাকের বসরা শহরের কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে ছিল এর অবস্থান। খ্রিস্টপূর্ব ১৯৬০ অব্দে দক্ষিণের আরব মরাভূমি থেকে যাযাবর শক্রো উত্তরে এগিয়ে এসে শহরটিকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। তখন আব্রাহাম তাঁর পরিবারের সঙ্গে উত্তর মেসোপটেমিয়ার একেবারে শেষ সীমানায় অবস্থিত হেরোন শহরে এসে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু আব্রাহামের একেশ্বরবাদী ধারণার জন্য খুব বেশি দিন তিনি সেখানে থাকতে পারেন নি। স্বদেশবাসীর মত আব্রাহাম নিজেও এক সময় বহু দেবদেবীর উপাসক ছিলেন। কী করে যে তাঁর মনে নিরাকার ঈশ্বরের ধারণার উদয় হল তা অস্পষ্ট। তবে ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থে বলা আছে যে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করে তাঁকে পরম জ্ঞান দান করেছিলেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততি পরম্পরাক্রমে পৃথিবীয় ছড়িয়ে পড়ে সব জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। আর আব্রাহামের নাম একটি মহান জাতির জনক হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তারপর পরমেশ্বর তাঁকে নিজেই পথ দেখিয়ে কেনান দেশে (বর্তমান ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, লেবানন ও জর্ডানের পশ্চিমাংশ) পৌছে দিয়েছিলেন। গোঁড়া ইহুদিরা এই কাহিনীটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। তবে পণ্ডিতদের মতে ইহুদিদের বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, এ কথা সত্য যে একেশ্বরবাদের প্রতি আব্রাহামের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে তাঁর আজ্ঞায়-পরিজনের বিরাগভাজনে পরিণত করে এবং তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আর প্রাচীন কেনান দেশের সমৃদ্ধির খ্যাতিই তাঁকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে আব্রাহাম বসতি স্থাপন করেছিলেন কেনানের দক্ষিণাংশে। বৃক্ষ বয়সেও যখন আব্রাহামের কোন সন্তান হল না তখন বংশ রক্ষার্থে তাঁর স্ত্রী সারাহ তাঁর এক মিশরিয় দাসী হ্যাগারের (বিবি হাজেরা) সঙ্গে ইব্রাহীমের বিয়ে দেন। হ্যাগারের গভর্নেন্ট ইসমাইলের জন্ম হয়। বাইবেলের বর্ণনা মতে, ঈশ্বরের কৃপায় অল্প কিছুদিন পরেই সারাহর গভর্নেন্ট ইহুদি জাতির পিতা আইজাকের (ইসহাক) জন্ম হয়। ফলে সারাহর পরামর্শক্রমে অনিচ্ছা সন্দেও আব্রাহাম হ্যাগারকে তাঁর পুত্র ইসমাইলসহ আরবের মর প্রান্তে নির্বাসিত করেন। ইসমাইলের বংশধররা একটি মহান জাতিতে পরিণত হবে বলে ঈশ্বর আব্রাহামকে আশ্বস্ত করেন। ইসমাইলের বংশধররাই পরবর্তীকালে আরব জাতিতে পরিণত হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আব্রাহামকে তাদের পূর্বপূরুষ হিসেবে বিবেচনা করলেও ইহুদিরা আইজাককেই আব্রাহামের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী

হিসেবে মনে করে।^১ কালক্রমে বংশবৃদ্ধির ফলে আইজাকের বংশধররা কেনানের মধ্য এবং উত্তর প্রদেশ নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে আব্রাহাম তাঁর পুত্র আইজাককে স্থানীয় ক্যানানাইট রমণীর সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে তাঁর পূর্বপূরুষের বাসভূমি ইরাক থেকে নিয়ে আসা রমণীর সঙ্গে বিয়ে দেন।^২ আইজাকের পুত্র ছিলেন জ্যাকব (ইয়াকুব আঃ)। জ্যাকবের অপর নাম ছিল ইসরায়েল। তাঁর নাম থেকেই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাষ্ট্রের নাম হয় ইসরায়েল। জ্যাকবের বার জন পুত্র বারটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে সমগ্র কেনান প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আব্রাহামের মৃত্যুর দুই থেকে আড়াইশ বছরের মধ্যেই মিশরিয়রা কেনান আক্রমণ করে এবং ইহুদিদেরকে জীবিতদাস হিসেবে মিশরে নিয়ে যায়। কেনানে পড়ে থাকল শুধু আদিবাসি অ-ইহুদিরা। তবে বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ইহুদিরা মিশরিয়দের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নয় বরং দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে আহারের সন্ধানে স্বেচ্ছায় মিশরে গিয়েছিল। মিশরে যাওয়ার আসল কারণ যাই হোক না কেন, মিশরে গিয়ে যে ইহুদিরা অবর্ণনীয় দুঃখ-কঠের শিকার হয়েছিল সে ব্যাপারে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও রয়েছে।

মোজেস ও ইহুদি জাতি

ইহুদিদের এ দুর্দশা থেকে মুক্ত করে যিনি তাদেরকে আবার কেনানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি হলেন ইহুদিদের নেতা মোজেস (মুসা আঃ)। খ্রিস্টপূর্ব ১২৯০ অব্দে তিনি ইহুদিদের নিয়ে মিশর হতে কেনানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তখন মিশরের রাজা ছিলেন ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী পথিমধ্যেই সিনাই পর্বতের উপর একটানা চালুশ দিন ধ্যানের পর মোজেস দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন এবং দুটি পাথরের স্লেটের উপর খোদাই করে লিখিত দশটি অনুজ্ঞা (Ten Commandments) নিয়ে ইহুদিদের মাঝে ফিরে এলেন। ইহুদিদের নিকট এ দশটি অনুজ্ঞা অত্যন্ত পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলে বিবেচিত। কিন্তু মোজেসের জীবনদশায় ইহুদিরা কেনানে পৌছাতে পারেনি। দুই পুরুষ ধরে মরাভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে ইহুদিরা এক যাযাবর জাতিতে পরিণত হয়েছিল। দূর থেকে পুণ্যভূমির ছায়াটুকু দর্শন করেই মোজেসের জীবনাবসান হয়। মোজেসের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা সত্যিই একদিন কেনানে পৌছাল। কেনানে পৌছেই তাদেরকে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে একটু একটু করে যিতু হতে হয়েছিল। দক্ষিণ উপকূলের আদিবাসী ফিলিস্তাইনদের সঙ্গে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি করতে হয়েছিল। পণ্ডিতরা অনুমান করেন এ ফিলিস্তাইন নামটি থেকেই সমগ্র কেনান দেশের নাম হয় প্যালেস্টাইন। রোমানরা নাকি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ইহুদিদের পরম শক্রদের নামানুসারে তাদের প্রিয় মাতৃভূমির এ নামকরণ করেছিল।

^১ Richard Allen, *Imperialism and Nationalism in the Fertile Crescent*, Colorado : West View Press, 1984, pp.14-15

^২ দেখুন Genesis 12:1-2, 16:1-3, 16:15, 21:2-3, 21:9-14, 24:3-4, The Old Testament, Authorized King James Version, Oxford Standard Text (1769)

রাজা সলের আমলে ইহুদি জাতি

ইহুদিরা যখন কিছুতেই আর ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে পেরে উঠছিল না তখন তাদের মধ্যকার এক উপজাতির নেতা স্ল কিছুটা লড়াই করে কিছুটা কৌশল অবলম্বন করে ফিলিস্টাইনদের হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন সব উপজাতির নেতারাই একবাক্যে সল্কে ইহুদি জাতির রাজা হিসেবে মেনে নিলেন। কিন্তু সল তাঁর শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় করার পূর্বেই ফিলিস্টাইনরা শক্তি সঞ্চয় করে ইহুদিদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে তাদেরকে পরাস্ত করে এবং দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য করে।

রাজা ডেভিডের সময় ইহুদি জাতি

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে ইহুদিদের স্বাস্থ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন মহাবীর ডেভিড (দাউদ আঃ)। রাজা ডেভিড বিপুল বিক্রিমে ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে লড়ে তাদেরকে চৃড়াস্তুত্বে পরাস্ত করেন। ইহুদিদের পূর্ব পূর্ব আব্রাহাম তাদের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচার করে মনের দিক থেকে খানিকটা এক করে গিয়েছিলেন। তারপর মোজেস পুনরায় একেশ্বরের উপাসনা স্থাপন করে এবং সেই সাথে তাঁর অনুজ্ঞাসমূহ জুড়ে দিয়ে সেই একতাকে আরো দৃঢ় করে তোলেন। আর রাজা ডেভিড রাষ্ট্রীয় একতা স্থাপন করে ইহুদিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি থেকে একটি জাতিতে উন্নীত করেন।

রাজা সলোমনের সময় ইহুদি জাতি

ডেভিডের মৃত্যুর পর ইহুদিদের রাজা হন তাঁর পুত্র সলোমন (সোলায়মান আঃ)। রাজ্যের সর্বত্র অট্টালিকা নির্মাণের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বোঁক ছিল। তাঁর অনন্য কৃতিত্ব হল জেরুজালেমে একটি ধর্মমন্দির (First Temple) নির্মাণ। মোজেস কর্তৃক প্রাপ্ত দশটি অনুজ্ঞা সম্বলিত স্টেট দুটি তিনি এই মন্দিরে স্থাপন করেন। তাঁর সময় ইহুদিরা একেশ্বরবাদ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়লেও জাতি হিসেবে তাদের মধ্যে ঐক্য বজায় ছিল। একটানা আট্টিশি বছর রাজত্বের পর খ্রিস্টপূর্ব ৯২৬ অন্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ধ্বনি বিভক্ত ও পরাজিত ইহুদি জাতি

রাজা সলোমনের মৃত্যুর পর সমগ্র ইহুদি জাতি আবার খণ্ড খণ্ড উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি রাজ্যটিও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দশটি গোত্রের সমষ্টিয়ে উন্নত ও মধ্য ফিলিস্টিনে গড়ে উঠে ইসরায়েল এবং বাকি দুটি গোত্রের সমষ্টিয়ে দক্ষিণ ফিলিস্টিনে গড়ে উঠে জুড়া রাজ্য। ইসরায়েলের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় স্যামেরিয়ায়, আর জুড়ার রাজধানী ছিল জেরুজালেমে। রাজ্য দুটির মধ্যকার যুদ্ধ বিঘাহের ফলে উভয় রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে। এসময় মেসোপটেমিয়ায় আসেরিয় নামে নতুন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আবির্ভাব ঘটে। আসেরিয়রা সিরিয়া ও মিশর জয়ের পর খ্রিস্টপূর্ব ৭২১ অন্দে ইসরায়েল দখল করে নেয়। স্মার্ট ধ্বনিয় সারগন লক্ষ লক্ষ ইসরায়েলিকে স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ করে অন্যত্র নির্বাসিত করেন এবং তাদের স্থানে অন্যসব পরাজিত দেশের প্রজাদের এনে পুনর্বাসিত করেন। সামান্য যে কয়জন ইসরায়েলি তারপরও স্যামেরিয়ায় ছিল তারা নবাগতদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ফলে একটি

নতুন জাতির উত্তর হয় যা স্যামেরিটান নামে পরিচিতি লাভ করে। নির্বাসিত ইসরায়েলিয়াও তাদের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে পারে নি। নির্বাসিত অবস্থায় তারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। অন্যদিকে জুড়া আসিয়িরিয়দের সঙ্গে আপোষ রফা করে করদ রাজ্য হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ অন্দে জুড়া নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্যাবিলনের দখলে চলে যায়। ব্যাবিলনের দুর্ধর্ষ রাজা নেবুচাদনেজার জেরুজালেমে ব্যাপক ধ্বন্যাত্মক চালান। রাজা সলোমন কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটিসহ সমগ্র জেরুজালেমকে একটি ধ্বন্যাত্মক পরিণত করেন। রাজা নেবুচাদনেজার জুড়িয়ানদের বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। তবে ব্যাবিলনের বন্দীদশা জুড়িয়ানদের জন্য খুব একটা কষ্টকর হয় নি। বিজেতাদের কাছ থেকে তারা অপেক্ষাকৃত ভাল আচরণই পেয়েছিল। ফলে তাদেরকে ইসরায়েলিয়দের মত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয় নি। এসময় থেকেই তারা জ্য বা ইহুদি নামে পরিচিতি লাভ করে। ইহুদিদের বিশ্বাস ছিল ধর্মমন্দির একমাত্র জেরুজালেমেই নির্মাণ করা চলে, অন্য কোথাও নয়। তাই ব্যাবিলনে তারা কোন মন্দির গড়ে তোলে নি। প্রতি স্যাবাথ ডে*-তে পালন করে সমাজের এক-একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাড়িতে জমায়েত হয়ে শাস্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা করত। সেসময় থেকেই ইহুদিদের এরকম সভাস্থল সিনাগগ বা সমাজবাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে।

গ্রিক শাসনাধীনে ইহুদি জাতি

রাজা নেবুচাদনেজারের মৃত্যুর মাত্র দুই দশক পরেই ব্যাবিলন নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পারস্যের দখলে চলে যায়। পারস্য স্মার্ট সাইরাস ব্যাবিলনে প্রবেশ করেই ইহুদিদের স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেন। ফলে প্রায় অর্ধ শতাব্দী নির্বাসনে থাকার পর খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ অন্দে ইহুদিরা আবার জুড়া রাজ্য ফিরে যাবার সুযোগ পায়। কিছু ইহুদি ব্যাবিলনে থেকেও গেল। জুড়ায় যারা গিয়েছিল তারা নামে মাত্র পারস্যের আনুগত্য স্বীকার করে স্বাসনের অধিকার পেল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মহাবীর আলেকজান্দ্রার পারস্য স্মার্ট তৃতীয় দরায়ুসকে পরাজিত করে গোটা সাম্রাজ্যে গ্রিক শাসনাধীনে চলে আসে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অন্দে ভারত থেকে ফিরার পথে ব্যাবিলনে আলেকজান্দ্রারের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রিক সাম্রাজ্য তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর এক সেনাপতি মেসিডেনিয়ার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অন্য সেনাপতি সেলিউকস সিরিয়া থেকে ব্যাকট্রিয়া প্রদেশ পর্যন্ত তাঁর

* ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে আছে, ইশ্বর সন্তানের ছয় দিন সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের পর সপ্তম দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। ইহুদিদের মতে, মানুষও তার সমস্ত কাজ সন্তানের ছয় দিনে শেষ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিবে। তাই ইহুদিরা প্রতি শনিবার কোন প্রকার কাজকর্ম ও আমোদ-প্রমোদ যোগ না দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে স্যাবাথ ডে পালন করে। অতটা নিষ্ঠার সঙ্গে না হলেও ইহুদিদের অনুসরণে খ্রিস্টনরাও প্রতি রবিবার স্যাবাথ ডে পালন করে থাকে। ইহুদিদের সম্পর্কে জানার জন্য আরো দ্রষ্টব্য আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, সভ্যতার ইতিহাস, পাঁচিন ও মধ্যযুগ, ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০০৮

শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশধররাই ইতিহাসে সেলুসিড নামে পরিচিত। আর ফিলিস্তিনসহ মিশর পেলেন অন্য আরেক সেনাপতি টলেমি। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮ অব্দে সেলুসিড স্মার্ট মিশরের টলেমি স্মার্টকে যুদ্ধে পরাজিত করে ফিলিস্তিনকে নিজ রাজ্য সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। এসময় সেলুসিড স্মার্টের দুর্বলতার সুযোগে ইহুদিদের রাজা জন হারকেনস জুডিয়া (জুড়ার গ্রিক নামকরণ) ছাড়িয়ে গ্যালিলি, স্যামেরিয়া এবং দক্ষিণাঞ্চলের ইডুমিয়াকে নিজ রাজ্যভূক্ত করেন। তাঁর এই রাজ্যের সীমা রাজা সলোমনের রাজ্যের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও জুডিয়ার বাইরের অঞ্চলসমূহের অধিবাসীরা তখন আর ইহুদি ছিল না। রাজা হারকেনস তাদেরকে ইহুদি বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন। হারকেনসের সময় থেকেই জুডিয়ার ইহুদিদের দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদিকে ছিল জেরুজালেমের ধর্মনিদের পুরোহিতবৃন্দ। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত বংশীয় ধনাচ্য ব্যক্তি। এর সঙ্গে ছিল সমাজের উপর তলার জমিদার-মহাজনরা। এই দলটি স্যাডুসিস নামে পরিচিত ছিল। অন্য দলে ছিল সাধারণ প্রজা ও গোঁড়া ইহুদি ধর্মায়জকরা। তারা ফ্যারিসিস নামে পরিচিত ছিল। রাজ হারকেনস এই দুই দলের মধ্যকার শক্ততাকে কাজে লাগিয়ে নির্বিঘ্নে রাজ্য পরিচালনা করতেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর রাজত্ব করে হারকেনস মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিল। তবে তাঁরা হারকেনসের মত অতটা প্রতাপশালী ছিলেন না। এক পর্যায়ে সিংহাসন দখল নিয়ে তাঁর দুই পৌত্রের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। এক পৌত্র পার্শ্ববর্তী ইডুমিয়ার শাসক অ্যান্টিপেটেরের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাজা হারকেনস ইডুমিয়া জয় করে অ্যান্টিপেটেরের বাবাকে জোড় করে ইহুদি বানিয়ে তাঁকে ইডুমিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

রোমান শাসনাধীনে ইহুদি জাতি

ইতোমধ্যে ইউরোপে রোমানরা গ্রিকদের স্থলাভিষিক্ত হয়। বিখ্যাত রোমান জেনারেল পম্পিস সেলুসিড স্মার্টকে পরাজিত করে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনসহ সিরিয়াকে রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন। এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেন অ্যান্টিপেট। ইতোমধ্যে জুলিয়াস সিজার ও পম্পিসের মধ্যে ক্ষমতার দ্঵ন্দ্ব শুরু হয়। সিজারের জয় অবশ্যিকী বুঝতে পেরে চতুর অ্যান্টিপেটের তাঁর পক্ষ নেন। যুদ্ধে পম্পিস সিজারের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। সিজার অ্যান্টিপেটেরকে ফিলিস্তিনের রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। অ্যান্টিপেটের তাঁর ছেট ছেলে হেরেডকে গ্যালিলি ও স্যামেরিয়া প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর বড় ছেলেকে জেরুজালেমের শাসনভার দেন। কিন্তু ইহুদিরা অ্যান্টিপেটেরকে তাদের রাজা হিসেবে মেনে নিতে পারে নি। তাঁর এক ইহুদি সেনাপতির হাতেই তিনি নিহত হন। কিন্তু খাঁচি ইহুদিদের কেউ সিংহাসনে বসতে পারে নি। রোমানদের সহযোগিতায় অ্যান্টিপেটের ছেলে হেরেড ইহুদিদের রাজা হয়ে বসলেন। তিনি বছর ধরে ইহুদিরা হেরেডের সঙ্গে লড়াই করল। ভাড়া করা রোমান সেপাই এনে হেরেড ফিলিস্তিনে রক্তের নদী বইয়ে দিলেন। ইহুদি ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ কেউ রক্ষা পেল না। ভাড়াটে সেপাইরা এমন

ভয়ঙ্কর জুনুমবাজি চালিয়েছিল যে, হেরেডের মত এমন নৃশংস লোককেও তাদের ডেকে থামতে বলতে হল। রোমান জেনারেলকে তিনি বলে পাঠালেন - “এরকম চললে আমি কাদের নিয়ে রাজত্ব করব? জনমানবহীন মরণভূমিই শেষে আমার রাজ্য হবে নাকি?”^৩ এত নৃশংসতার পরও ইহুদিরা হেরেডকে তাদের রাজা বলে স্বীকার করে নি। অবশেষে হেরেড অন্যভাবে ইহুদিদের মন জয়ের চেষ্টা চালান। তিনি দূর-দূরান্ত থেকে বহু মূল্যবান নির্মাণ সামগ্ৰী এনে রাজা নেবুচাদনেজার কর্তৃক ধৰ্মস্পাষ্ট মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করেন (Second Temple)। কিন্তু ইহুদিরা এই ইডুমীয় তিনি পুরুষে ইহুদি হেরেডকে কখনও তাদের মনে স্থান দেয় নি। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর রাজত্ব করে খ্রিস্টপূর্ব ৪ অব্দে হেরেড মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উইল করে ফিলিস্তিনকে তাঁর তিনি পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যান।

কিন্তু ইহুদিরা তাঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রোমান স্মার্টকে সরাসরি ফিলিস্তিন শাসনের অনুরোধ জানায়। ইহুদিদের আশা ছিল, পারসিক শাসনামলের মত রোমান শাসনেও তারা সুখে-শাস্তিতে বসবাস করবে। তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রোমান স্মার্ট অগাস্টাস সিজার হেরেড-পুত্রদের বদলে ফিলিস্তিনে একজন রোমান প্রোকিউরেটর নিযুক্ত করেন। তিনি সিরিয়ায় নিযুক্ত রোমান ভাইসরয়ের অধীনে থেকে ফিলিস্তিন শাসন করতে থাকেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রোমানদের সম্পর্কে ইহুদিদের মোহভন্দ হয়। বিদ্রোহের শুরুটা ধর্মীয় কারণে হলেও একের পর এক করের বোঝায় অতিষ্ঠ ইহুদিরা বিদ্রোহটিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্বিত করে। ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সেনাপতি টিটাস কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন। রোমান ঐতিহাসিক ফ্ল্যাডিয়াস জোসেফাসের মতে এই বিদ্রোহে ১১,০০,০০০ ইহুদি মারা যায়। ৯৭,০০০ ইহুদিকে বন্দী করে দাস বানিয়ে সাম্রাজ্যের অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়। হাজার হাজার ইহুদি পালিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে আশ্রয় নেয়। জেরুজালেম একটি ধৰ্মস্পন্দনে পরিণত হয় এবং হেরেড কর্তৃক নির্মিত ইহুদিদের ধর্ম মন্দিরটি ধৰ্মস্পাষ্ট পুনৰ্নির্মাণ হয়।^৪ তারপরও ফিলিস্তিনে থেকে যাওয়া ইহুদিরা ১৩২ খ্রিস্টাব্দে আবার বিদ্রোহ করে। ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। প্রায় ৫,৮০,০০০ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ইহুদিদের Talmud (ইহুদি ধর্মায়জকদের সংকলিত ইহুদি আইন-কানুন, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কিত গ্রন্থ) হতে জানা যায়, “The Romans went on killing (Jews) until their horses were submerged in blood to their nostrils....until the blood flowed forty Roman miles into the sea....”^৫ এই বিদ্রোহের পর ফিলিস্তিনে ইহুদিরা আর রাজনৈতিক

^৩ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, সীশুচরিত, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ.৫৪

^৪ Flavius Josephus, *The Wars of the Jews*, Book VI, Chapter 9, Para 3. Available at earlyjewishwritings.com

^৫ *Jerusalem Talmud Ta'anit* 4:6 (68d-69a): Rabbi Akiva and Bar Kokba. (1 Roman mile= 1620 yards/1481 meters)

ভাবে সংগঠিত হতে পারে নি। ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিন রোমান শাসনাধীনে ছিল। এরপর ৩৯৫-৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের, ৬৩৮-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরব মুসলমানদের এবং ১৫১৭-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কিদের শাসনাধীন ছিল। ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে তীর্থস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ইহুদিদের ফিলিস্তিনে আগমন অব্যাহত ছিল। দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে, তীর্থস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অথবা অত্যাচার-নিপীড়নে বাধ্য হয়ে বসবাসের উদ্দেশ্যেও ইহুদিরা ফিলিস্তিনে এসেছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন কখনো নিষিদ্ধ ছিল না।

বিতাড়িত ইহুদিদের অবস্থা

আত্মাহাম কর্তৃক ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের পর খুব কম সময়ই ইহুদিরা স্থানাধীনতা ভোগ করেছে। ইহুদি রাজা সল, ডেভিড ও সলোমনের শাসনামলকে ইহুদিদের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া অবশিষ্ট সময়ে ইহুদিদের ইতিহাস ছিল দাসত্ব ও বঞ্চনার ইতিহাস। নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান এবং তাদের দ্বারা ফিলিস্তিন দখল ও ইহুদিদের বিতাড়নের ফলে একসময় ফিলিস্তিন প্রায় ইহুদি শূন্য হয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাসিত ইহুদিরা ক্রমে তাদের মনিবদ্দেরকে মুক্তিপ্পণ দিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও তারা পূর্ণ নাগরিক মর্যাদা পায় নি। ইউরোপের সর্বাত্ত্ব তাদেরকে বহিরাগত হিসেবে দেখা হত। ইউরোপিয়দের কাছে ইহুদিরা ছিল একটি উটকো বামেলা। উপরন্তু যীশুর হত্যাকারী হিসেবে তারা ছিল ঘৃণিত। মূল ধারার পেশা এবং স্বাভাবিক সমাজ জীবন ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। শহরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দেয়াল ঘেরা স্থানের মধ্যে তাদের বসবাস সীমাবদ্ধ ছিল। ইহুদিদের এই বসতিগুলি পরবর্তীতে ঘেট্টো নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯১৫ সালে ইতালির ভেনিসে স্থাপিত ইহুদিদের বসতি Geto Nuovo নাম হতে ঘেট্টো শব্দটির উৎপত্তি হয়। সহজে চেনার উপায় হিসেবে তাদেরকে বিশেষ ধরনের পোষাক যেমন, ব্যাতিক্রমী হাট অথবা ব্যাজ পরিধানে বাধ্য করা হয়। এছাড়া মধ্যযুগের ইউরোপে ফিলিস্তিনদের মধ্যে ইহুদিদের সম্পর্কে বেশ কিছু কুসংস্কার ছিল। কোন ইহুদির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কোন ফিলিস্তিন যদি অসুস্থ বোধ করত, তাহলে দোষ পড়ত গিয়ে সেই ইহুদিটির উপর, ফিলিস্তিন লোকটি ভাবত নিশ্চয়ই ইহুদিটি তাকে কোন জাদু করেছে। যদি ফিলিস্তিনদের ফসল হানি ঘটত এবং ঝঁঁ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হত তাহলে এর পিছনেও কোন ইহুদির হাত রয়েছে বলে তারা মনে করত। মোট কথা, গোটা ইউরোপে ইহুদিরা ছিল একটি অপয়া ও অলঙ্কুণে জাতি, যাদের দেখলেই ফিলিস্তিনদের যাত্রা ভঙ্গ হত।^১ এছাড়া প্রায়ই ফিলিস্তিনরা সংঘবন্ধভাবে ইহুদি বসতিগুলিতে আক্রমণ করে যীশু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করত।

^১ James Parkes, *A History of the Jewish People*, Baltimore, Penguin Books, 1964, p.85

মধ্য যুগের ইউরোপে ইহুদিদের জমি ক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা চাষাবাদে নিযুক্ত না হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়। ব্যবসা ক্ষেত্রে ইহুদিদের সাফল্যের কারণেও তারা ফিলিস্তিনদের স্বীকার কারণ হয়। প্রথম ত্রুট্সেডের সময় দরিদ্র ফিলিস্তিনরা সংঘবন্ধভাবে ইহুদি বসতিগুলি আক্রমণ ও লুটতরাজ করে জেরুজালেমে যাওয়ার খরচ যোগায়। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে প্রেগ রোগের বিস্তার ঘটলে ইহুদিরা ভয়াবহতম নির্যাতনের শিকার হয়। খাবার পানি সংগ্রহের কুয়াগুলিতে গোপনে প্রেগ রোগের জীবান ছাড়ানোর অভিযোগে ফিলিস্তিনরা নির্মতভাবে ইহুদিদের উপর হত্যায়জ চালায়। সেই তুলনায় বরং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং মুসলিম শাসিত স্পেনে ইহুদিরা অনেক বেশি সম্মানের সঙ্গে বসবাস করত। এমনকি এসব দেশে ইহুদিরা অনেকে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপে ইহুদিরা যে শুধু নির্যাতিত হয়েছিল তাই নয়, নানা অজুহাতে তাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। ১২৯০ সালে ইংল্যান্ড ও ইতালি এবং ১৩০৬ সালে ফ্রান্স থেকে তারা বিতাড়িত হয়। অনেককে জোর করে ফিলিস্তিন বানানো হয়। আইবেরীয় উপদ্বীপের ইহুদিদেরকে হয় ফিলিস্তিন ধর্ম গ্রহণ অথবা দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। এসব দেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা পূর্ব ইউরোপ ও আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য শাসকের পরিবর্তন অথবা নতুন আইন প্রণয়নের সুযোগে এসব ইহুদিদের অনেকেই আবার পশ্চিম ইউরোপে ফিরে আসে। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইহুদিদের প্রতি একপ বৈম্য ও নির্যাতনের কারণেই ইহুদিরা স্থানীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় নি। সমাজ থেকে বিছিন্ন হয়ে সংঘবন্ধভাবে বসবাসের ফলে তারা নির্বিশ্বে তাদের ধর্মীয় আচার প্রথা পালনের সুযোগ পায়। হালাল খাবার (কোশার ফুড) গ্রহণ এবং হানুকা, পাশ ওভার, রোশ হাশোনা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তারা তাদের পূর্ব পূর্বের স্মৃতিবিজ্ঞিত ফিলিস্তিনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করত। কোন একদিন তারা স্বপ্নের দেশ ফিলিস্তিনে ফিরে যাবে, এই বিশ্বাস তাদেরকে ফিলিস্তিনদের সকল প্রকার দমন-নির্যাতনের মধ্যেও কিছুটা স্বত্ত্ব এনে দিত।

ড্রাইফুস ঘটনা

ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইহুদিদের অবস্থার উন্নতি হয়। তারা অন্যান্যদের মত সমান নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। ফলে ইহুদিদের একটি অংশ তাদের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে যাওয়ার পক্ষে মত প্রদান করে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত ড্রাইফুস ঘটনার ফলে ইহুদিদের এই মনোভাবে ছেদ পড়ে। ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রাইফুস ছিলেন ফরাসি সেনাবাহিনীর একজন ইহুদি কর্মকর্তা। ১৮৯৪ সালে ফরাসি সামরিক বাহিনীর গোপনীয় তথ্য প্যারিসহ জার্মান দৃতাবাসে পাচারের অভিযোগে ফরাসি সামরিক আদালত তাঁকে আজীবনের জন্য ফরাসি গায়ানার ডেভিলস আইল্যান্ডে নির্বাসন দণ্ড দেয়। কিন্তু দুই বছর পর ঘটনা পরম্পরায় ড্রাইফুস নির্দেশ প্রমাণিত হন এবং এই বিষয়ে ফরাসি সেনাবাহিনীর মেজর পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে। তারপরও ফরাসি

সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা বিষয়টি ধারাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। এমনকি ফরাসি প্রতিকার্য ড্রাইফুসের নির্দোষিতার বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পরও তাঁর শাস্তি মওকুফের ব্যাপারে ফরাসি সামরিক কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করে। অবশেষে ১৯০৬ সালে ফরাসি সামরিক কমিশন ড্রাইফুসকে মুক্তি দিয়ে স্বপদে বহাল করে। ইহুদিরা মনে করে একমাত্র ইহুদি হওয়ার কারণেই অন্যের দোষ ড্রাইফুসের উপর চাপানো হয়েছিল।



আলফ্রেড ড্রাইফুস



থিওডর হার্জল

ইহুদি মনীষীদের বক্তব্য

ড্রাইফুস বিচারের সময় ভিয়েনা ভিত্তিক Neue Freie Press পত্রিকার প্যারিস প্রতিনিধি হিসেবে ইহুদি সাংবাদিক থিওডর হার্জল ফ্রান্সে অবস্থান করছিলেন। ১৮৬০ সালে বুদাপেস্টে জনগ্রহণকারী হার্জল নিজেও ইহুদি হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময় বৈষ্যম্যের শিকার হয়েছেন। এগুলিকে তিনি কোন পরিকল্পিত ঘটনা হিসেবে মনে না করে বিছিন্ন ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু ড্রাইফুস ঘটনা তাঁর এই চিন্তায় পরিবর্তন আনে। ফরাসি বিপ্লবের এক শতাব্দী পর খোদ ফ্রান্সেই ড্রাইফুস বিচারের মত ঘটনা হার্জলকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি বুঝতে পারেন ইউরোপে ইহুদিরা কোন দিনই বৈষম্যমুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে না। তাই ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Jewish State (Der Judenstaat)* গ্রন্থে তিনি ইহুদিদের সমস্যা সমাধানে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। অবশ্য তাঁর পূর্বেও অনেকে এ ধরণের বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইহুদি ধর্ম্যাজক হিরশ কালিশার (Rabbi Hirsch Kalischer 1795-1848) সম্পর্কিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহুদিদেরকে তাদের পূর্ব পূর্ক্যামের ভূমি ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। জার্মান ইহুদি মোজেস হেস (Moses Hess 1812-1875) ১৮৬২ সালে প্রকাশিত তাঁর *Rome and Jerusalem* গ্রন্থে ইহুদিদের দুর্দশা ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ইউক্রেনে জনগ্রহণকারী ইহুদি চিকিৎসক লিও পিনস্কার (Leo Pinsker 1821-1891) তাঁর *Auto-emancipation: a Warning of a Russian Jew to his Brethren* (1882) গ্রন্থে বিশ্বব্যাপী

এন্টিসেমিটিজ'ম'র* মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং ইহুদিদের একটি নিজস্ব ভূ-খণ্ড অর্জনের মাধ্যমে একটি জাতি গঠন করে এই সমস্যা সমাধানের কথা বলেন। তবে তাঁর মতে, নিজস্ব ভূ-খণ্ডটি যে ফিলিস্তিনেই হতে হবে এমন কোন কথা নেই।^১ হার্জলের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, হার্জল তাঁর মতবাদকে একটি আন্দোলনে রূপ দিতে পেরেছিলেন।

জাইয়েনবাদী আন্দোলন

দীর্ঘ দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসের সময় ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ইহুদিরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের এক অংশের মতে কোনরপ প্রচেষ্টা ছাড়াই দৈশ্বরের ইচ্ছায় একদিন তারা ফিলিস্তিনে ফিরে যাবে। তারা মনে করে, দৈশ্বর বেমন তাদের পূর্ব পূরুষ আব্রাহামকে পথ দেখিয়ে কেনান দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি দৈশ্বরের প্রত্যাদেশে তারাও একদিন ফিলিস্তিনে ফিরে যাবে। আর অন্য দলের মতে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইহুদিদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শেষোক্ত মতবাদের অনুসারীরাই জাইয়েনবাদী নামে পরিচিত। জেরুজালেমে রাজা ডেভিড ও সলোমনের মন্দিরের নিকটে অবস্থিত জাইয়েন পাহাড়ের নাম হতে জাইয়েনবাদী শব্দটি এসেছে। উনিশ শতকের শেষদিকে এই জাইয়েনবাদী আন্দোলনের সূচনা এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে বিশেষত রাশিয়া ও পোল্যান্ড থেকে ইহুদিদের ক্রমাগত ফিলিস্তিনে আগমনের ফলে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি রচিত হয়।

বিশ্ব জাইয়েনবাদী সংস্থা গঠন ও জাইয়েনবাদী আন্দোলনের বিকাশ

১৮৯৭ সালের ২৯ আগস্ট হার্জলের আহ্বানে সুইজারল্যান্ডের বাস্ল শহরে জাইয়েনবাদীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই বিশ্ব জাইয়েনবাদী সংস্থা (World Zionist Organization) গঠিত হয় এবং হার্জল এই সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলনে যোগদানকারী ১৯৭ জন ইহুদি প্রতিনিধি ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত পোষণ করে। ওসমানিয় সুলতানের উপর জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের প্রভাব রয়েছে। তাই ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কাইজারের সঙ্গে দেখা করে ওসমানিয় সুলতানের সঙ্গে কাইজারের আসন্ন সাক্ষাতকারে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায়

* ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা, বৈষম্য ও বিদ্যেপ্রস্তুত মনোভাব। অর্থের দিক থেকে এন্টিসেমিটিজ শব্দটি সেমেটিজমের বিপরীত শব্দ নয়। কেননা সেমিটিক ভাষাভূক্ত আরবসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বৈষম্য বা বিদ্যের বিষয়টি ইউরোপে প্রাসঙ্গিতা পায়নি।

¹ Ahron Bregman, *A History of Israel*, New York : Macmillan, 2003, p.4

সুলতানের অনুমতি আদায়ের জন্য অনুরোধ করেন। নভেম্বর মাসে হার্জল আবার কাইজারের সঙ্গে দেখা করে ওসমানিয় সুলতানের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু এসময় তিনি কাইজারকে অত্যন্ত শীতল ও মৌন দেখতে পান। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে, সুলতানের সঙ্গে আলোচনায় তিনি হার্জলের অনুরোধটি উপস্থাপনই করেন নি। তারপরও হার্জল আশা ছাড়েন নি। ১৮৯৭ সালে হার্জল Die Welt নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, যা জাইয়নবাদীদের মুখ্যপথে পরিণত হয়। ১৮৯৯ ও ১৯০০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাইয়নবাদী সংস্থার তৃতীয় ও ৪৩^১ সম্মেলনে ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাই জাইয়নবাদী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বলে স্থির হয়। এই ব্যাপারে সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে হার্জল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্রিটিশ সরকার জাইয়নবাদীদের ফিলিস্তিনের বদলে উগাভায় বসতি স্থাপনের কথা বলে। ১৯০৪ সালে বিশ্ব জাইয়নবাদী সংস্থার সপ্তম সম্মেলনে ব্রিটিশ সরকারের এই বিকল্প প্রস্তাবটি প্রত্যাখাত হয়। এই বছরই মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ইহুদি রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা থিওডর হার্জল মৃত্যুবরণ করেন। ভিয়েনায় তাঁর বাবার সমাধির পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর দেহাবশেষ স্থানান্তরিত করে জেরুজালেমের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে সমাহিত করা হয় এবং পাহাড়টির নামকরণ করা হয় Mount Herzl। পরে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে নিহত অনেক ইহুদি বীরপুরুষকে এখানে সমাহিত করা হলে এটি একটি সামরিক সমাধিস্থলে (Military Cemetery) পরিণত হয়।^২

জাইয়নবাদ বিরোধী ইহুদিদের বক্তব্য

হার্জলের মৃত্যুর পরও অব্যাহতভাবে জাইয়নবাদী আন্দোলন চলতে থাকে। তবে এসময় ইহুদিদেরই একটি অংশ আন্দোলনটির বিরোধিতা করে। গোঁড়া ইহুদিরা এই আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রে সমালোচনা করে। তাদের মতে জাগতিক কোন সংস্থার মাধ্যমে নয়, দৈশ্বরের হস্তক্ষেপেই একদিন তারা জেরুজালেমে ফিরে যাবে। সমাজবাদী ইহুদিরা জাইয়নবাদকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে একে প্রত্যাখান করে। সংক্ষারবাদী ইহুদি সিনাগগের র্যাবাইগণ এই আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী চরিত্রের বিরোধিতা করে। তাদের মতে জুডাইজম বলতে ধর্মকে বুঝায়, জাতিকে নয়। একই যুক্তিতে ‘ব্রিটিশ ইহুদি প্রতিনিধি সভা’ (Board of Deputies of British Jews) এবং ‘ইঙ্গ-ইহুদি সংস্থা’ (Anglo-Jewish Association) জাইয়নবাদকে প্রত্যাখান করে। ১৯১৭ সালের ২৪ মে সংগঠন দুটির সভাপতি ‘দি টাইমস’ পত্রিকায় জাইয়নবাদের রাজনৈতিক চরিত্রে সমালোচনা করেন এবং একে ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন। এছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকায় যেসব ইহুদি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল তারা জাইয়নবাদকে একটি ভারসাম্য বিনষ্টকারী আন্দোলন হিসেবে

^১ Ahron Bregman, *Ibid.*, p.6

অভিহিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি সংগঠন American Jewish Committee-র নেতৃ জ্যাকব শিফ, লুই মার্শাল প্রমুখ জাইয়নবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু তারপরও ইহুদিদের নিকট জাইয়নবাদ একটি জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত হয়। জাইয়নবাদীরা তাদের দাবির সমর্থনে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সক্ষম হয়, যা ব্যালফোর ঘোষণা নামে পরিচিত।

ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি

ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাইয়নবাদীদের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিরা বসবাসের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে আসতে থাকে। ১৮৮০ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫,০০০। এর দুই-তৃতীয়াংশ জেরুজালেমে এবং বাকিরা অন্যান্য পবিত্র স্থান যেমন সাফেদ, টাইবেরিয়াস ও হেব্রনে বাস করত। এছাড়া জাফা এবং হাইফাতেও কিছু ইহুদির বসবাস ছিল। এসব ইহুদিদের অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকার ইহুদিদের প্রেরিত অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৮৮০-র দশকে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে একদল ইহুদি বসবাসের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে আসে। ইহুদিদের এ আগমন প্রথম আলিয়া নামে পরিচিত। ১৯০৪ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আরো অনেক ইহুদি ফিলিস্তিনে আসে যা দ্বিতীয় আলিয়া নামে পরিচিত। ফলে ১৯১৪ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৫,০০০-এ যা ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ।^৩ অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সংখ্যা কমে হয় ৫৬,০০০।

ব্যালফোর ঘোষণা ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে। তবে ঘোষণাটি বাস্তবায়নের জন্য ইহুদিদেরকে আরো ত্রিশতি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এসবয়ের মধ্যে তাদেরকে ঘোষণাটির প্রতি বৃহৎ শক্তিবর্গের স্থীরূপ আদায় করতে হয়েছিল এবং আরবদের সঙ্গে দীর্ঘ রক্ষণ্যী সংগ্রামে লিঙ্গ হতে হয়েছিল। ব্যালফোর ঘোষণাটির মাধ্যমে ব্রিটিশ সহানুভূতি অর্জনের পর জাইয়নবাদীদের লক্ষ্য হয় মিত্রপক্ষের অন্যান্য শক্তি কর্তৃক ঘোষণাটির অনুমোদন। ১৯১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স এবং একই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি ইতালি ঘোষণাটিকে স্থীরূপ দেয়। ১৯১৮ সালের ২৯ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উদ্রূ উইলসন এক পত্র মারফত Rabbi Stephen S. Wise কে ব্যালফোর ঘোষণার প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা জানান। ফলে জাইয়নবাদীরা মিত্রশক্তির আনফিলিয়াল মিত্রে পরিণত হয় এবং মিত্রশক্তির জয় পরাজয়ের সঙ্গে ব্যালফোর ঘোষণার ভাগ্য জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভের পেছনে জাইয়নবাদীদের কতটা ভূমিকা ছিল তা বলা মুশকিল। তবে ১৯৩৬ সালে প্যালেস্টাইন রয়েল কমিশনের সামনে ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন সময়ের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জের বক্তব্য হতে এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। কমিশনের সামনে

^২ Bernard Reich, *A Brief History of Israel*, New York : Checkmark Book, 2008, p.13

তিনি বলেছিলেন - “জাইয়েনবাদী নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে প্রতিক্রিতি দিয়েছিলেন যে, যদি মিত্র পক্ষ ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে তাহলে তাঁরা মিত্রশক্তির পক্ষে সমগ্র বিশ্বের ইহুদিদের সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়ের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। তাঁরা তাঁদের কথা রেখেছিলেন।”

ব্যালফোর ঘোষণার খবর বাদশাহ হুসেইনের নিকট পৌছালে তিনি এ বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা জানতে চান। জবাবে ব্রিটেন ১৯১৮ সালের ৪ জানুয়ারি তার কায়রোহু আরব যুরোর কমান্ডার D.G. Hogarth-এর মাধ্যমে হুসেইনকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, ফিলিস্তিনী আরবদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেই ব্রিটেন ইহুদিদের ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে এবং ব্যালফোর ঘোষণায় ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোন প্রতিক্রিতি দেয়া হয়নি। হুসেইন বিষয়টি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মীমাংসার জন্য রেখে দেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন পূর্বে জেনারেল এলেনবার নেতৃত্বে ফিলিস্তিনের এক বৃহৎ অংশে ব্রিটিশ সামরিক দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন ও জাইয়েনবাদ

যুদ্ধের পর ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের সমন্বয়ে জাইয়েনবাদীদের একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যোগদান করে। যদিও জাইয়েনবাদীরা কোন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছিল না তবুও তারা প্যারিসে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা লাভ করে। ড. ওয়াইজম্যান, অধ্যাপক ফ্রান্কফুর্টের, জ্যাকব ডি হ্যাস, নাহম সকোলোসহ আরো অনেকে ছিলেন এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত। ব্যালফোর ঘোষণাটিকে তারা আর তাদের ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি দ্বিপক্ষিক বিষয় হিসেবে রাখার পক্ষপাতী ছিল না। ঘোষণাটির পক্ষে একটি আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা আদায়ের বিষয়টি ছিল তখন তাদের সামনে প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা। ব্যালফোর ঘোষণাটিকে শান্তিচুক্তির ধারাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তারা এ উদ্দেশ্য পূরণের পথে অগ্রসর হয়। তারা ফিলিস্তিনের আরব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে। তারা জাতীয় আত্মনির্মাণাধিকারেরও বিরোধিতা করে। কেননা এ নীতি প্রয়োগ করা হলে ফিলিস্তিন একটি আরব রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এমনকি তারা ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পাদিত সাইক্স-পিকো চুক্তি অনুসারে ফিলিস্তিনের আন্তর্জাতিকীকরণেরও বিরোধিতা করে। তারা চেয়েছিল এ অঞ্চলে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হোক যা ব্রিটিশ স্বার্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। শান্তি সম্মেলনে জাইয়েনবাদীরা একটি স্মারকলিপি উপস্থাপন করে যা সকলের সহানুভূতিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে। অবশেষে তাদের এ দাবি-দাওয়া গুলো সফলতার মুখ দেখেছিল। ১৯২০ সালের ২৫ এপ্রিল সুগ্রীম কাউন্সিল ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি শাসনের পক্ষে মত দেয়। এ ব্যাপারে ফরাসি বিরোধিতার সন্তান থাকায় ফরাসি জাইয়েনবাদীরা পূর্বেই ফরাসি সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের দাবির পক্ষে সমর্থন আদায় করে নিয়েছিল। ১৯২২ সালের ২২ জুলাই লীগ অব নেশনসের কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনের ম্যান্ডেটরি শাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়। শুধু তাই নয় ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি

হুবহ ব্যালফোর ঘোষণার মতই ম্যান্ডেটের ধারায় সংযুক্ত করা হয়। ম্যান্ডেট দলিলের ৪নং ধারায় ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় ম্যান্ডেটের শক্তিকে সহযোগিতা করার জন্য একটি ইহুদি পর্ষদ (Jewish Agency) কে স্থানীয় দেয়ার কথা বলা হয়। বিশ্ব জাইয়েনবাদী সংস্থার প্রেসিডেন্ট এই পর্ষদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনের ব্যাপারে এই পর্ষদ ছিল ইহুদিদের অফিসিয়াল মুখ্যপাত্র। ব্রিটেন কর্তৃক একে অভিবাসী নির্বাচনের আইনগত অধিকার দেয়া হয়। ফলে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের মধ্যে যারা ইহুদি পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হত এবং যাদের নিকট পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট ছিল কেবল তারাই স্ব স্ব দেশে অবস্থিত ব্রিটিশ কনস্যুলেটে ফিলিস্তিনের ভিসার জন্য আবেদন করতে পারত। ম্যান্ডেটের শাসনের অধিকাংশ সময়ই বিশ্ব জাইয়েনবাদী সংস্থার নেতৃত্বের সুবাদে ডঃ ওয়াইজম্যান ইহুদি পর্ষদের প্রেসিডেন্ট (প্রথম বার ১৯২১-১৯৩১, দ্বিতীয় বার ১৯৩৫-১৯৪৬) ছিলেন। ফিলিস্তিনে এই পর্ষদের একটি স্ট্যাভিং এক্সিকিউটিভ কমিটি ছিল, যার প্রধান ছিলেন ডেভিড বেন গুরিয়েন।

ম্যান্ডেটের শাসনাধীনে ফিলিস্তিন

ম্যান্ডেটের শাসক হিসেবে ব্রিটেন ফিলিস্তিনে সামরিক শাসনের বদলে বেসামরিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বিখ্যাত ব্রিটিশ ইহুদি পরিবারের সদস্য স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল ফিলিস্তিনের প্রথম হাইকমিশনার নিযুক্ত হন। নতুন বেসামরিক প্রশাসন ইহুদি অভিবাসীদের জন্য ফিলিস্তিনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। আরবরা এর প্রতিবাদ করে এবং ১৯২১ সালে ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা দেখা দেয়। ফলে তৎকালীন ব্রিটিশ ওপনিবেশিক সচিব উইলস্টন চার্চিল ১৯২২ সালের ৩ জুন একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন, যা ‘চার্চিল মেমোরেন্ডাম’ নামে পরিচিত। এতে তিনি ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি আরবদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, ব্যালফোর ঘোষণায় সমগ্র ফিলিস্তিনকে ইহুদি আবাসভূমিতে পরিণত করার কথা বলা হয়নি এবং ইহুদি অভিবাসনে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রিটেন ফিলিস্তিনের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতি লক্ষ রাখবে। শ্বেতপত্রটি বিশ্ব জাইয়েনবাদী সংস্থার অনুমোদন লাভ করলেও আরবরা এর বিরোধিতা করে। তখন থেকেই ম্যান্ডেটের কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনে ইহুদি আগমনের ক্ষেত্রে বাংসরিক কেটা অনুসরণ করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনার সুবিধার্থে এখানে বসবাসরত ইহুদি ও আরবদের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইহুদি সম্প্রদায়

ইহুদিদের ফিলিস্তিন থেকে বিভাগিত হলেও ফিলিস্তিন কখনো একেবারে ইহুদি শূন্য ছিল না। কিছু ইহুদি বসতি ফিলিস্তিনে সব সময়ই ছিল। আর ধর্মীয় পরিবেশ স্থান হওয়ায় প্রতি বছরই পার্শ্ববর্তী আরব দেশসমূহ এবং ইউরোপ-আমেরিকা হতে অনেক ইহুদি

তীর্থস্থান অমগের উদ্দেশে ফিলিস্তিনে পাড়ি জমাতো। ইহুদি পর্যন্ত ছাড়াও ফিলিস্তিনে ইহুদিদের নিজস্ব নির্বাচিত সংসদ ও একটি কার্যকরী পরিষদ (Vaad Leumi) ছিল, যা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। ইহুদি সমাজে বেশ কিছু রাজনৈতিক দলও ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিতাড়িত জীবন যাপনের সময় ইহুদিরা মাটির সঙ্গে কোনোরপ সম্পর্ক গড়ে তোলেনি। অর্থাৎ কৃষিকাজের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই তাদের ঝোঁক ছিল বেশি। কিন্তু ফিলিস্তিনে ইহুদিরা বেশ কিছু যৌথ কৃষি খামার গড়ে তুলেছিল। ইহুদি চিন্তাবিদ বের বরোচভ (Ber Borochov) বলেন, ইহুদিরা আবার চাষী ও শ্রমিক না হওয়া পর্যন্ত ইহুদি সমাজের সুস্থান্ত্র ফিরে আসবে না। বরোচভের সঙ্গে যোগ দেন আরেক ইহুদি চিন্তাবিদ এ. ডি. গর্ডন (Aaron David Gordon)। তিনি বলেন চাষাবাদ হতে হবে ইহুদিদের ধর্ম এবং চাষীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইহুদি সমাজ ও রাষ্ট্র। তিনি বলেন, "The Land of Israel is acquired through labor, not through fire and not through blood." এই দুইজন ইহুদি চিন্তাবিদের প্রভাবেই ১৯০৯ সালে গ্যালিলি সমুদ্রের তীরে ডেগানিয়াতে প্রথম ইহুদি সমবায় বসতি বা কিবুর্জ (Kibbutz) প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর তেল আভিভ শহরটিও প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষিতে সফল আজকের ইসরায়েলের পেছনে রয়েছে এই কিবুর্জ আন্দোলন। ইউরোপ আমেরিকায় বসবাসকারী ইহুদিরা নিজেদের পছন্দ মত এলাকার কিবুর্জকে অকাতরে টাকা পাঠাতে থাকে। গড়ে উঠতে থাকে কৃষিমুখী সমবায় আন্দোলন এবং তার ফলে বর্ধিষ্ঠ সব গ্রাম। বুদ্ধিমান ইহুদিরা কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ক্ষাত্র থাকেনি নতুন নতুন ফসলও উন্নত করতে থাকে। সারা বিশ্বে জাফা (Jaffa) নামে যে সুমিষ্ট কমলা এবং গালিয়া (Galia) নামে যে সেরা তরমুজ বিক্রি হচ্ছে সেই দুটি ফল ইসরায়েলেই প্রথম উৎপাদিত হয়। শুধু এই দুটি ফল বিক্রি করেই ইসরায়েল বহু কোটি ডলার আয় করেছে। ক্রমেই ইহুদি চাষীদের হাতে মরণভূমির চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। বরোচভ-গর্ডনের চিন্তার ফলে ইসরায়েলের ইহুদিরা অভ্যন্তর হয়েছে কৃষি ও কাষিক পরিশৃঙ্গে। আরবদের আক্রমণ হতে খামারগুলোকে রক্ষা করার জন্য তারা ১৯০৯ সালে হাশোমার (Ha-Shomer) নামে পরিচিত একটি রক্ষী বাহিনী গঠন করে যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হাগানাহ (Haganah) নাম ধারণ করে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে কৃষি সম্প্রসারণের চেয়ে শিল্পোন্নয়নের প্রতিই তাদের আগ্রহ ছিল বেশি। আধুনিক কল-কারখানা স্থাপন ও পরিকল্পিত উপায়ে শিল্পযন্ত্রের ফলে স্ফুর্দ্ধ ইহুদি বসতিটি পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের বেলজিয়ামে পরিণত হয়। ফলে খুব সহজেই পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলো এর শিল্পগোর এক বৃহৎ বাজারে পরিণত হয়। এসব কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য হিসতাদ্রুত (Histadruth) নামে একটি ইহুদি শ্রমিক ফেডারেশন গড়ে উঠে। এই সংস্কৃত নিয়ন্ত্রণে অনেক কলকারখানা, কৃষি সমবায়, হাসপাতাল, স্কুল ব্যাংক ইত্যাদি পরিচালিত হত। ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতিগুলোর আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এর নাগরিক জীবন। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইহুদিদের শতকরা মাত্র ২৩.৮ ভাগ গ্রামে বাস করত। বাকিরা

অত্যাধুনিক চিকিৎসালয়, বিনোদনকেন্দ্র এবং উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থাসহ যাবতীয় নাগরিক সুবিধা নিয়ে শহরে বাস করত। মোট কথা মরুভূমি আর জগতে তারা স্ফুর্দ্ধ এক খণ্ড ইউরোপ গড়ে তোলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ ইউরোপিয়ান ইহুদিদের ভাষা ছিল ইডিশ (Yiddish), যেটা এসেছিল জার্মান ভাষা থেকে। বাইবেলের হিন্দু ভাষা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে মৃত ছিল। ইহুদি ভাষাবিদ এলিজার বেন-ইহুদার তৎপরতার ফলে ফিলিস্তিনে ইহুদি জাইয়েনবাদী সংস্থাগুলি স্থাপন করে তাদের সাংগঠনিক ভাষা হবে হিন্দু। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী যেসব ইহুদি মধ্যপ্রাচ্যে বসতি স্থাপন করতে এসেছিল তাদের একতাবদ্ধ করে হিন্দু ভাষা। অনেকে নিজের নাম বদলে ফেলে হিন্দু নামও রাখেন। যেমন - ডেভিড গ্রিন তাঁর নাম পরিবর্তন করে সিংহ শাবক কথাটার হিন্দু অনুবাদ বেনগুরিয়ন শব্দটি নিজের নাম হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ন আর কখনও নিজেকে ডেভিড গ্রিন হিসেবে পরিচয় দেননি। এভাবে প্রথম হিন্দু ভাষী শহর তেল আভিভ প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ভাষার ব্যাপক চর্চা, কিবুর্জ আন্দোলন এবং অন্যান্য ইহুদি অর্থনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মিলেমিশে একটি নতুন জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করে।



স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল



ডেভিড বেনগুরিয়ন

আরব সম্প্রদায়

অন্যদিকে ফিলিস্তিনে বসবাসরত আরবদের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহুদিদের মত রাজনৈতিকভাবে তারা সংগঠিত ছিল না। ইহুদি পর্যন্তের মত স্বার্থরক্ষাকারী কোন সংস্থাও তাদের ছিল না। ইহুদিদের পাশ্চাত্য ধাঁচের সংস্দীয় গণতন্ত্রের বদলে তারা সুপ্রীম মুসলিম কাউন্সিল দ্বারা শাসিত হত। সরকার অনুমোদিত এ কাউন্সিলের কিছু সদস্য ব্রিটিশ হাইকমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। এ কাউন্সিলের উপর মুসলিম ধর্মীয় আদালত ও ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। রাজনৈতিকভাবে আরবরা ছিল বিভক্ত। ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষ আমিন আল হসাইনীকে এই কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে। একই সাথে তাঁকে জেরুজালেমের গ্রান্ড মুফতি হিসেবেও নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু জেরুজালেমের মেয়র রায়িব বে নাশাশিবির সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধ ছিল। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় সকল দিক থেকেই আরব সমাজ ছিল ইহুদিদের চেয়ে অনেক বেশি পশ্চাদপদ। আরব জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগই গ্রামে বাস করত, যার মধ্যে আবার ৬৫,০০০ ছিল যায়াবর। আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাদের

কোন যোগাযোগ ছিল না। আরবরা সন্তান পদ্ধতিতে চাষাবাদ করত। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবেশী খ্রিস্টানদের তুলনায়ই তারা ছিল পশ্চাদপদ। আর ইউরোপ থেকে আগত ইহুদিদের তুলনায় তারা ছিল একেবারে মধ্যযুগীয়। যেখানে ইহুদি ছেলেমেয়েদের শতকরা ১০০ ভাগই স্কুল যেত সেখানে আরবদের স্কুলগারী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ^{১০} ইহুদিদের এ উন্নয়নে পাশ্চাত্যের ধনী ইহুদিদের উদার হস্তে দান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। অথচ ফিলিস্তিনী আরবদের বাইরে থেকে সহযোগিতা করার মত কেউ ছিল না। বরং ফিলিস্তিনের ধনী আরবরা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে বিলাস-বাসনে জীবনযাপন করতে থাকে। ফলে শহরবাসী ধনী আরব ও গ্রামের দরিদ্র আরবদের মধ্যকার ব্যবধান বাঢ়তে থাকে।

বৈপরীত্যে ভরপুর এই দুটি সমাজের দায়িত্ব অর্পিত হল ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষের উপর। ভারত, মিশর ও সুদানের ব্রিটিশ প্রশাসনের মত ফিলিস্তিনের ম্যান্ডেটরি প্রশাসন এতটা দক্ষ ছিল না। ফলে ইউরোপিয় দেশসমূহ হতে আগত উচ্চ শিক্ষিত ইহুদি নেতৃত্বনের সামনে এ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগ্যতা ছিল একেবারেই মুন। ইহুদি নেতৃত্বনের অনেকেই পাশ্চাত্যের নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কৃতি ছাত্র ছিলেন। আধুনিক সমাজের সমস্যাবলি সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন। আধুনিক শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় তাঁদের জানা ছিল। ফিলিস্তি নকে একটি আধুনিক ইহুদি রাষ্ট্রে পরিগত করার জন্য বাস্তবসম্মত কর্মপর্ষ্ণ গ্রহণের মত দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল। সর্বোপরি যেকোন আন্তর্জাতিক সমস্যা অনুধাবন করার ও যেকোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিজেদের সমস্যা যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপন করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। শিক্ষিত ও বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন এসব ইহুদি নেতৃত্বনের সামনে ম্যান্ডেটরি প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিলেন নিষ্পত্ত। ফলে ম্যান্ডেটরি প্রশাসনকে ইহুদিদের স্বার্থের পক্ষে পরিচালিত করা তাঁদের জন্য কঠিন কিছু ছিল না। অন্যদিকে ধর্মান্তর আরব নেতাদের ধর্মের নামে জনসাধারণকে উদ্বিগ্ন করার ক্ষমতা থাকলেও সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসূরণ করেই তাঁরা আধুনিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। এছাড়া ইহুদিদের মত ম্যান্ডেটরি প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করাতো দূরের কথা নিজেদের মধ্যকার নেতৃত্বের সংকট কাটিয়ে উঠাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অঞ্চল প্রাকারের সংঘর্ষ

আরবদের এই পশ্চাদপদতা সত্ত্বেও তারা ম্যান্ডেটরি শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই সংস্কীর্ণ গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাতে থাকে। ক্রমবর্ধমান হারে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমনের বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষের শাসনামলে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল ঝঁঝঁবিক্ষুক। ১৯২৯ সালের অঞ্চল প্রাকারের সংঘর্ষ (Wailing Wall Incident) আরব-ইহুদি সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটায়। জেরুজালেমে অবস্থিত আল-আকসা মসজিদ সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেয়ালটি (Western Wall) অঞ্চল প্রাকার বা Wailing Wall নামে পরিচিত। দেয়ালটির সঙ্গে

^{১০} George Lenczowski, *Ibid.* p.395

ইহুদিদের ধর্মীয় আবেগ জড়িত ছিল। ইহুদিদের রাজা সলোমন কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে নির্মিত প্রথম মন্দিরটি (First Temple) খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলোনিয়রা ধ্বংস করে ফেলে। পরবর্তিতে হেরেড মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করলেও ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা আবারও মন্দিরটি (Second Temple) ধ্বংস করে দেয়। রোমানদের দ্বারা মন্দিরটি ধ্বংসের পরও এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেয়ালটি অক্ষতাবস্থায় টিকে ছিল। ইহুদিদের মতে দৈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের নির্দর্শন হিসেবে দেয়ালটিকে অক্ষত রেখেছেন। তারপর থেকে ইহুদিরা এ দেয়ালের সামনে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করে অক্ষ বিসর্জন করত। ইহুদিদের এ কাজে ইতোপূর্বে আরবরা কখনও বাধা দেয়নি। কিন্তু ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহুদিরা দেয়ালটির পাশে চেয়ার পেতে বসার আয়োজন করে। আরবরা এ পদক্ষেপকে পবিত্র আল-আকসা মসজিদ দখলের পাঁয়তারা বলে মনে করে। প্রাচীনত্বের দিক থেকে মুক্তার পরেই ছিল আল-আকসার স্থান।



অঞ্চল প্রাকার

আর পবিত্রতার দিক থেকে কাবা শরীফ ও মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববীর পরেই ছিল আল-আকসা। মুসলমানদের প্রিয় নবী হ্যারত মুহাম্মদ (সা) এখান থেকেই মেরাজ গমন করেছিলেন। তাই এ স্থানটি হাতছাড়া করতে তারা কিছুতেই রাজি ছিল না। ১৯২৯ সালের ১৫ আগস্ট শত শত ইহুদি Western Wall এর সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দেয় “The wall is ours”. তারা সেখানে Jewish National Flag উত্তোলন করে এবং জাইয়নবাদী সঙ্গীত পরিবেশন করে। পরস্পর বিরোধী এ অবস্থান সংঘর্ষের সূত্রপাত করে।

এ সংঘর্ষে আরবদের দ্বারা ১৩৩ জন ইহুদি নিহত এবং ৩৩৯ জন আহত হয়। অন্যদিকে নিহত আরবদের সংখ্যা ছিল ১১৬ জন এবং আহত হয় ১৩২ জন। অবশ্য আরবদের অধিকাংশই ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক হতাহত হয়। এ সংঘর্ষের কারণ নির্ণয় এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে সুপারিশের জন্য ব্রিটিশ সরকার স্যার ওয়াল্টার শ'কে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে যা 'শ' কমিশন নামে পরিচিত।

সংঘর্ষের কারণ হিসেবে কমিশন ইহুদিদের প্রতি আরবদের জাতিগত বিদ্যে, রাজনৈতিক হতাশা ও অর্থনৈতিক অনিচ্যতাকে দায়ী করে। ভবিষ্যতে এ ধরণের সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য ইহুদি ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে আরো সর্তকতা অবলম্বনের সুপারিশ করে কমিশন। কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ইহুদি ইমিগ্রেশনের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের জন্য স্যার জন হোপ সিম্পসনকে প্রধান করে আরেকটি কমিশন গঠন করে এবং এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ইহুদি ইমিগ্রেশন স্থগিত রাখে। কমিশন দেখলো ক্রমবর্ধমান হারে আগত ইহুদিদের ধারণ করার মতো পর্যাপ্ত ভূমি ফিলিস্তিনে নেই। আরব কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনিতেই শোচনীয়। তাদের অধিকাংশই বর্গী চাষী, তার উপর রয়েছে আবার বেকারত্বের বোঝা। তাই এ কমিশন ইহুদি ইমিগ্রেশন আপাতত বন্ধ রাখার সুপারিশ করে।

যখন উন্নত প্রযুক্তির চাষাবাদের মাধ্যমে এখানকার কৃষকরা তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে তখনই কেবল নতুন করে ইহুদি আগমন সম্ভব বলে কমিশন মন্তব্য করে। ১৯৩০ সালের অক্টোবরে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। এ মাসেই একটি শ্বেতপত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিন বিষয়ক নীতি ঘোষণা করে। ব্রিটেনের তৎকালীন উপনিবেশিক সচিব লর্ড প্যাসফিল্ড এ শ্বেতপত্রটি প্রকাশ করেন বলে তাঁর নাম অনুসারে শ্বেতপত্রটি প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্র (Passfield White Paper) নামে পরিচিত। এ শ্বেতপত্রের বিয়য়বস্ত্বও হোপ সিম্পসন কমিশনের রিপোর্টের মত আরবদের অনুকূলে গিয়েছিল। কেননা এতে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন সীমিত করার জন্য জোরালো সুপারিশ করা হয়। ফলে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন উন্নেখযোগ্য হারে হাস পায়। সঙ্গত কারণেই আরবরা ব্রিটিশ সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় এবং ইহুদিরা এর বিরোধিতা করে। সমগ্র বিশ্ব থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রতিবাদ আসতে থাকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড বিষয়টি নিয়ে মারাত্মক অস্থিতিতে পড়েন। ইহুদিদের অসম্মোহ প্রশমনের জন্য তিনি ১৯৩১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ড. ওয়াইজম্যানকে এক পত্র লিখেন। পত্রে তিনি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি ফিলিস্তিনের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইহুদি ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষের রয়েছে বলে

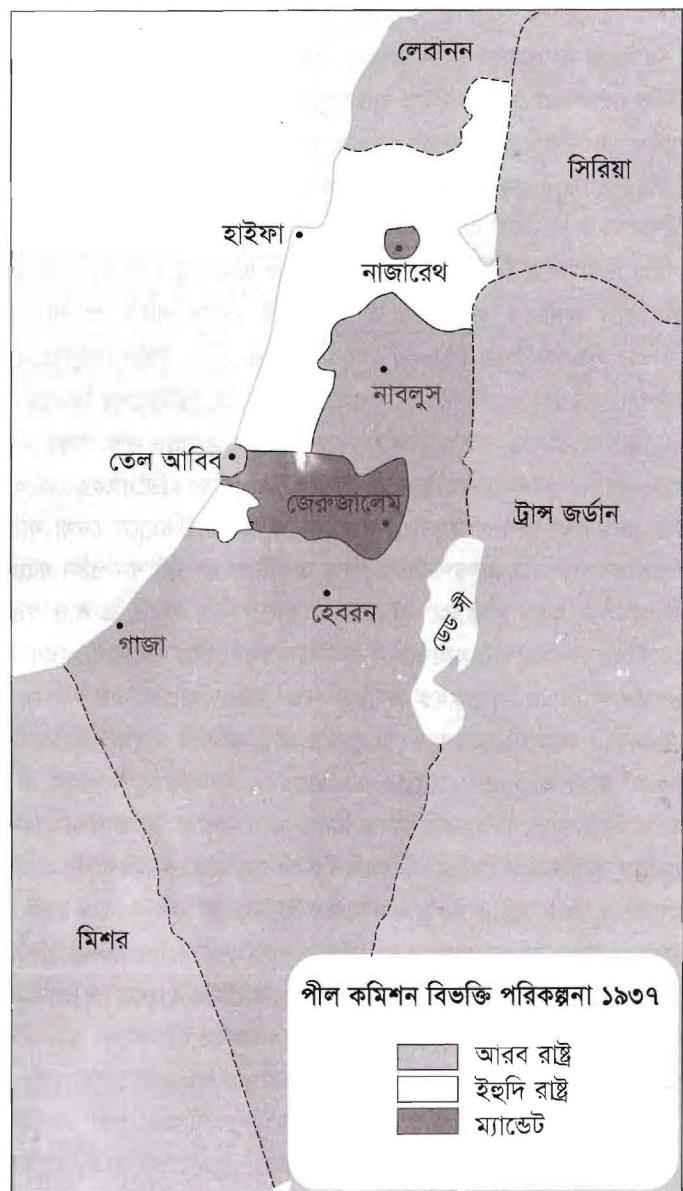
উল্লেখ করেন। অচিরেই তিনি সরকারি মালিকানাধীন ভূমি ইহুদি ও আরবদের জন্য বরাদ্দ করার অঙ্গীকার করেন এবং ইহুদিদের মধ্যে যারা ফিলিস্তিনে এসে কাজ খুঁজে পেতে সক্ষম তাদেরকে আসার অনুমতি দেয়া হবে বলে ওয়াইজম্যানকে আশ্বস্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্রের বদলে চার্চিল শ্বেতপত্রে ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। তাঁর এ পত্রে ইহুদিরা আশ্বস্ত হলেও প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্রের সমর্থক আরবরা এই পত্রকে 'A black frame for the White Paper' বলে অভিহিত করে।

পীল কমিশন

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলারের আবির্ভাব এবং তাঁর ইহুদি বিরোধী নীতি গ্রহণের ফলে ফিলিস্তিনে আবারও ইহুদিদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে যা পুনরায় ইহুদি বিরোধী দাঙ্গার সূত্রপাত করে। ১৯৩৫ সালে প্রায় ৬০,০০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে আগমন করে।^{১১} ফলে আরবরা ইহুদী বিরোধী দাঙ্গার পাশাপাশি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে করে। এ বিদ্রোহ ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। ক্রমবর্ধমান ইহুদি আগমনের বিরুদ্ধে আরবদের এসব বিদ্রোহের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ছিল গংবাধা। ম্যান্ডেটরি শাসনের ইতিহাসে দেখা যায় যখনই কোন দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছে তখনই কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছে এবং প্রতিবাই কমিশন একটি দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেছে। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এবারও কর্তৃপক্ষ আরব বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৬ সালে লর্ড পীলের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে একটি কমিশন প্রেরণ করে যা রাজকীয় কমিশন নামে পরিচিত। বিদ্রোহ চলাকালে এ কমিশন ১৯৩৬ সালের ১১ নভেম্বর ফিলিস্তিনে আগমন করে। ড. ওয়াইজম্যান ইহুদিদের পক্ষে কমিশনের নিকট তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু সুপ্রীম মুসলিম কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আমিন আল হসাইনী এ কমিশনের সামনে কোন প্রকার বক্তব্য প্রদানে অস্থীকৃতি জানান এবং ফিলিস্তিনে সম্পূর্ণভাবে ইহুদি আগমন বন্ধের দাবি জানান। যদিও আরবরা অফিসিয়ালি কমিশনকে বয়কট করেছিল তথাপি আমিনী বিরোধী আরব নেতা জেরজালেমের সাবেক মেয়ের রাঘবে বে আল-নাশাশিবী কমিশনের কাছে ওয়াইজম্যানের বক্তব্যের জবাবে আরবদের পক্ষে আনঅফিসিয়ালি এক বক্তব্য প্রেরণ করেন। কমিশন ১৯৩৭ সালের ১৮ জানুয়ারি ব্রিটেনে ফিরে আসে এবং ৭ জুলাই রিপোর্ট প্রদান করে।

^{১১} D. R. Elston, Israel, *The Making of a Nation*, Oxford : Oxford University Press, 1963, p.27

পীল কমিশন বিভক্তি পরিকল্পনা ১৯৩৭



রিপোর্টে কমিশন ম্যান্ডেট ব্যবস্থা বিলুপ্তির পক্ষে মত দেয় এবং ফিলিস্তিনকে একটি আরব রাষ্ট্র ও ইহুদি রাষ্ট্রে ভাগ করার সুপারিশ করে। কমিশন শুধুমাত্র জেরুজালেম ও বেথেলহেমকে ম্যান্ডেটের শাসনাধীন রাখার কথা বলে। ফিলিস্তিনের দক্ষিণ ও মধ্য-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে আরব রাষ্ট্র। আর উত্তর ও মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে ইহুদি রাষ্ট্র। প্রস্তাবিত আরব রাষ্ট্রটি আয়তনে বড় হলেও এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ ছিল অনুন্নত ও অনুর্বর। ইহুদি ইমণ্টেশনের ব্যাপারে বলা হল আগামী পাঁচ বছর বাংসরিক ১২ হাজারের বেশি ইহুদি ফিলিস্তিনে আগমন করতে পারবে না।^{১২} আমিন আল হুসাইনীর নেতৃত্বে আরব উচ্চতর পরিষদ (১৯৩৬ সালে গঠিত) ফিলিস্তিন বিভক্তির এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। ১৯৩৭ সালের ৩-১৭ আগস্ট জুরিখে জাইয়নবাদী সংস্থার সম্মেলনে রিপোর্টটি গৃহিত না হলেও প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট সীমানা নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উডহেড কমিশন

১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পীল কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য উডহেড কমিশন (Woodhead Commission) নামে একটি কমিশন ফিলিস্তিনে প্রেরণ করে। একই সাথে কমিশনকে নিজস্ব মতামত প্রদানেরও স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। উডহেড কমিশন পীল কমিশনের প্রস্তাব ছাড়াও ফিলিস্তিন বিভক্তির আরো দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। "Plan A" – এর অন্তর্ভুক্ত ছিল পীল কমিশনের প্রস্তাব, "Plan B" এবং "Plan C" – এর মধ্যে কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ "Plan C" – এর পক্ষে মত দেয়। "Plan C" – এর বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

১. ফিলিস্তিনের উপকূলীয় ১,২৫০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল নিয়ে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যা ফিলিস্তিনের মোট আয়তনের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ।
২. জেরুজালেমে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের শাসন চালু থাকবে এবং অবশিষ্ট অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে আরব রাষ্ট্র।

ফিলিস্তিন বিভক্তির সুপারিশ করায় আরবরা এ কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যাখান করে। অন্যদিকে প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের সীমানা মনপুত না হওয়ায় ইহুদিদের রিপোর্টটি প্রত্যাখান করে।

গোলটেবিল বৈঠক ও শ্বেতপত্র প্রকাশ

এমতাবস্থায় সমস্যার একটি সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। ড. ওয়াইজম্যানের নেতৃত্বে ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল লন্ডনে আগমন করে। আরবদের পক্ষে ফিলিস্তিন ছাড়াও মিশর, ইরাক, সুইডি আরব, ট্রাস জর্ডান এবং ইয়েমেনের প্রতিনিধি দল লন্ডনে গমন করে। তবে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি মনোনয়ন নিয়ে একটি

^{১২} The Peel Commission Report (July 1937), Available at <http://www.jewishvirtuallibrary.org>

সমস্যা দেখা দেয়। আরব বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ম্যাডেটরি কর্তৃপক্ষ আরব নেতৃত্বদের উপর গ্রেফতার ও নির্যাতন চালায়। অনেককে ফিলিস্তিন হতে বিভাগিত করে। আরব উচ্চ পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং জেরুজালেমের মুফতি আমিন আল হসাইনীকে মুফতি পদ হতে পদচূড় করে ও তাঁর বিকল্পে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করে। ফলে ব্রিটেনের পক্ষে ফিলিস্তিনী আরবদের মুখ্যপাত্র নির্বাচন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে ব্রিটেন মধ্যপথে ফিলিস্তিনী আরব নেতৃ রাঘব বে আল-নাশাশিবি ও আরব উচ্চ পরিষদের কয়েকজন সাবেক সদস্যকে নিয়ে একটি ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি দল গঠন করে। আমিন আল হসাইনী নির্বাসনে থাকলেও সমগ্র ফিলিস্তিনে তাঁর প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। তাই ব্রিটেন প্রতিনিধি দলের মধ্যকার আরব উচ্চ পরিষদের সাবেক নেতৃবৃন্দকে আমিনীর মতামত গ্রহণের পরামর্শ দেয়।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ লস্তনের সেন্ট জেমস্ প্যালেসে গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আরবরা ইহুদিদের সঙ্গে এক টেবিলে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ব্রিটেনকে উভয় পক্ষের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনায় বসতে হয়। আলোচনায় উভয় পক্ষই নিজ নিজ অবস্থানে অন্তর্ভুক্ত থাকে। আরবরা স্বাধীনতার দাবি জানায় এবং অবিলম্বে ইহুদি ইমিগ্রেশন বন্ধের কথা বলে। অন্যদিকে ইহুদিরা ব্যালফোর ঘোষণার বাস্তবায়ন এবং ফিলিস্তিনে নির্বিশ্বে ইহুদি ইমিগ্রেশনের দাবি জানায়। ফলে কোন সমর্থনাত্মক ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়।

১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকার আর একটি শ্বেতপত্রের মাধ্যমে তার ফিলিস্তিন বিষয়ক নীতি ঘোষণা করে। ফিলিস্তিন বিভক্তির বিরুদ্ধে আরব জনমত সম্পর্কে ব্রিটেন আগে থেকেই অবগত ছিল। আরবদের দাবি ছিল অবিভক্ত ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা। কেননা অবিভক্ত ফিলিস্তিন স্বাধীন হলে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের দ্বারাই শাসিত হবে। শ্বেতপত্রে ব্রিটেন আগামী দশ বছরের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতা দেয়ার কথা ঘোষণা করে। ইহুদি ইমিগ্রেশন সম্পর্কে বলা হল আগামী পাঁচ বছরে ৭৫,০০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে আসতে পারবে। এরপর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন বন্ধ করে দেয়া হবে। শ্বেতপত্রে ইহুদিদের নিকট জমি বিক্রয় সংক্রান্ত অংশে ফিলিস্তিনকে তিনটি অংশে ভাগ করার কথা বলা হল - প্রথম অংশে ইহুদিদের নিকট জমি বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়, দ্বিতীয় অংশে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং তৃতীয় অংশে জমি ক্রয়-বিক্রয় স্বাভাবিক ভাবে চলবে বলে উল্লেখ করা হয়।^{১০}

ইহুদিরা এ শ্বেতপত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা একে আরবদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং ইহুদিদের প্রতি প্রতিশ্রূতিভঙ্গ বলে অভিযুক্ত করে। কেননা এতে ইহুদিদের জন্য কোন পৃথক আবাসভূমির কথা বলা হয়নি এবং পাঁচ বছর পর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘসূত্রিতার নীতি এবং ইহুদি আগমন বন্ধ করার কথা না থাকায়

^{১০} British White Paper of 1939. Available at http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp

আরবরাও শ্বেতপত্রটি প্রত্যাখান করে, যদিও শ্বেতপত্রটি পরিণামে আরবদের পক্ষেই গিয়েছিল। অন্যদিকে লীগ অব নেশনসের স্থায়ী ম্যাডেট কমিশন শ্বেতপত্রটিকে ম্যাডেটের ধারাসমূহের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করে।

আরবদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পেছনে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে আরব দেশসমূহে জার্মানি ও ইতালির প্রচার-প্রচারণা আশক্ষাজনক হারে বৃদ্ধি পায়। ফিলিস্তিনে ক্রমবর্ধমান হারে ইহুদি আগমন এবং এজন্য ব্রিটেনকে দায়ী করে আরবদের নিজ পক্ষে টানার জার্মান ও ইতালিয় নীতি ব্রিটেনকে অস্বাক্ষিতে ফেলে। তাই অনেকটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটেই ব্রিটেন শ্বেতপত্রের মাধ্যমে আরবদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইহুদিরা মিত্রশক্তি তথা ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। পাশাপাশি তারা শ্বেতপত্রের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ডেভিড বেন গুরিয়নের উক্তি থেকে শ্বেতপত্র সম্পর্কে ইহুদিদের মনোভাব জানা যায়। তিনি বলেন, ‘We will assist the British in the war as if there were no White Paper and we must resist the White Paper as if there were no war.’^{১১} ড. ওয়াইজম্যান মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে যুদ্ধ করার জন্য একটি স্বাধীন ইহুদি সেনা ইউনিট গঠনের দাবি জানান। শুধুমাত্র ইহুদিদের সমর্থয়ে একটি স্বাধীন সেনা ইউনিট গঠন করলে আরবদের মধ্যে ক্ষেত্রের সৃষ্টি হতে পারে বলে ব্রিটেন এক্ষেত্রে কিছুটা কৌশলী নীতি অবলম্বন করে। ব্রিটেন Palestine Pioneer Corps এর অধীনে আরব এবং ইহুদি উভয় পক্ষকেই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানায়। তবে যুদ্ধে যোগদানের ক্ষেত্রে আরবরা খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। ১৯৪৪ সালের আগ পর্যন্ত ব্রিটেন তার এ নীতি বজায় রেখেছিল। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে যখন যুদ্ধের ফলাফল মিত্রশক্তির অনুকূলে ঘাস্তিল তখন ব্রিটেন একটি Jewish Bigrade গঠন করতে রাজি হয়। ব্রিটেনের এই যুদ্ধকালীন নীতি সফল হয়েছিল এ অর্থে, ব্রিটেনের সক্ষক্তিকালে ব্রিটেন আরবদেরকে ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

স্ট্রামা দুর্ঘটনা ও বিল্টমোর প্রোগ্রাম

যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনে মিত্র শক্তির প্রচুর সেনা মোতায়েন থাকায় সেখানে এক ধরনের কৃতিম শাস্তি বিবরাজ করে। কিন্তু এই শাস্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ইউরোপে জার্মান অধিকৃত অঞ্চল হতে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ব্যাপক সংখ্যক ইহুদি অবৈধভাবে ফিলিস্তিনে আসতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় Struma নামে একটি ইহুদি যাত্রীবাহী জাহাজ রুমানিয়া থেকে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরবদের প্রতিবাদের কথা বিবেচনা করে জাহাজটিকে ফিলিস্তিনে নোসর করার অনুমতি দেয়নি। তিনিদিন পর জাহাজটি ইস্তাম্বুলে নোসর করে এবং সেখান থেকে

^{১১} Quoted in Rabbi Daniel Allen, Celebrating Reform Zionism for the sake of heaven

জাহাজের যাত্রীদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গোপন আলোচনা চলতে থাকে। কয়েক সপ্তাহ আলোচনার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র তাদেরকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের অনুমতি দেয়। কারো কারো ব্রিটিশ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ থাকায় তারা ফিলিস্তিনে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিল। বাকি যাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন তুরক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করেই জাহাজটিকে কৃষ্ণ সাগরে পাঠিয়ে দেয়। ১৯৪১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকট শব্দ করে জাহাজটি নিমজ্জিত হয়। ফলে ৭৭৮ জন যাত্রী মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্বের ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পিছনে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পিছনে অতিরিক্ত যাত্রীবহন ও নির্মাণ ক্রটি দায়ী ছিল। বেশির ভাগ যাত্রীকেই জাহাজ ছাড়ার পূর্বে জাহাজটি দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে জাহাজটি দেখে তারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়। অত্যন্ত ছোট কেবিন, অপরিসর বসার জায়গা, ক্রটিপূর্ণ ইঞ্জিন এবং মাত্র একটি লাইফ বোট নিয়ে জাহাজটি ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ফলে মাসাধিককাল তুরক্ষের উপকূলে ইত্তেকাঁঃ ঘুরাফেরার পর জাহাজটি নিমজ্জিত হয়। ইহুদি বিরোধীদের মতে ইহুদিরা নিজেরাই জাহাজটি ডুবিয়ে দিয়ে তাদের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। ১৯৬৪ সালে একজন জার্মান ঐতিহাসিক উদঘাটন করেন জাহাজটি ডুবার পেছনে দায়ী ছিল একটি সোভিয়েত টর্পেডো। এক গোপন আদেশবলে টর্পেডোটি কৃষ্ণ সাগরে জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়। তবে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পেছনে যে কারণকেই দায়ী করা হোক না কেন এর ফলে ইহুদিদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা ফিলিস্তিন পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে বিশ্ব জাইয়েনবাদী সংস্থার ২১ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর যুদ্ধজনিত কারণে সংস্থাটি নিয়মিত সম্মেলন আয়োজনে ব্যর্থ হয়। তাই উন্নত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১৯৪২ সালের ৬ - ১১ মে American Zionist Organization-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে অবস্থিত বিল্টমোর হোটেলে ইহুদিদের এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ইহুদি পর্যদের প্রেসিডেন্ট ডেভিড বেন শুরিয়ন কিছু পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন যা বিল্টমোর প্রোগ্রাম নামে পরিচিত। এই প্রোগ্রামে - ১. সমগ্র ফিলিস্তিন নিয়ে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ২. একটি ইহুদি সেনাবাহিনী গঠনের দাবি জানানো হয়। ৩. ১৯৩৯ সালের শেতপত্রকে প্রত্যাখান করা হয় এবং ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বদলে ইহুদি পর্যদের নিয়ন্ত্রণে ফিলিস্তিনে সীমান্তিনভাবে ইহুদি ইমিশ্রণের দাবি জানানো হয়। পরিকল্পনাটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বন্দের সমর্থন লাভ করে। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইহুদিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

ফিলিস্তিনে ইহুদি সন্তাসবাদ

ইহুদিদের আগমনের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ এবং মার্কিন ইহুদিদের সমর্থন লাভে উৎসাহিত হয়ে ফিলিস্তিনে ইহুদিরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। যুদ্ধের সময় ইহুদি পর্যদ আনুষ্ঠানিকভাবে আরবদের সঙ্গে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সম্মত হলেও কট্টেরপন্থি কিছু ইহুদি সংগঠন এতে সম্মত হয়নি। এসব সংগঠনের মধ্যে নব্য জাইয়েনবাদী সংস্থার (New Zionist Organisation) নাম উল্লেখযোগ্য। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের তিনটি আন্দোলনার প্রতিক্রিয়া বাহিনী ছিল। এর মধ্যে হাগানা একটি বৃহৎ প্রতিরক্ষা বাহিনী, যা আরবদের আক্রমণ হতে ইহুদি বসতিগুলিকে বক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। শারীরিকভাবে সশ্রম অধিকাংশ ইহুদি এর সদস্য ছিল। অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও বাহিনীটির উদ্দেশ্য প্রতিরক্ষামূলক হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এর কার্যক্রম বন্দের কোন পদক্ষেপ নেয় নি। জিবতিনক্ষির নেতৃত্বাধীন সংস্কারবাদীদের বাহিনীর নাম ছিল ইরগান। বাহিনীটি সন্তাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকলেও মাঝে মধ্যে আরবদের সঙ্গে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মেনে চলেছে। পোলিশ ইহুদি আব্রাহাম স্টার্ন-এর নেতৃত্বে ইরগানেরই একটি কট্টেরপন্থি গ্রুপ ফিলিস্তিনে ব্যাপক সন্তাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তারা কখনও আরবদের সঙ্গে সহাবস্থান নীতি মেনে নেয়নি। ১৯৪২-১৯৪৩ সালে ইরগান ও স্টার্ন গ্যাং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বিল্টমোর প্রোগ্রাম মানতে বাধ্য করতে সন্তাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইহুদিদের অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার এক অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। বিপুল সংখ্যক অবৈধ অস্ত্রের চালান আসতে থাকে ইহুদিদের হাতে। এছাড়া মিশ্রশক্তির অস্ত্র চুরির অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।^{১০} এসব অবৈধ অস্ত্র তারা সন্তাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতে থাকে। ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ বিরোধী সন্তাস চরম আকার ধারণ করে। এ বছর ফিলিস্তিনের হাইকমিশনার জেরজালেম-জাফা সড়কে সন্তাসী আক্রমণের শিকার হন এবং অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। ২. নভেম্বর সন্তাসীরা কায়রোতে নিযুক্ত মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক পরামর্শদাতা লর্ড মোনকে (Lord Moyne) হত্যা করে। ইরগান এবং স্টার্ন গ্যাং বেপরোয়াভাবে ব্রিটিশ পুলিশ স্টেশন এবং সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। Jewish Agency এসব কর্মকাণ্ডের নিম্ন করলেও বদ্ধ করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

ঝ্যাংলো-মার্কিন কমিশন

যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ৩১ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্যান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলিকে অবিলম্বে ১ লক্ষ ইহুদিকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রিটিশ সরকার এর জবাবে ফিলিস্তিনে অতিরিক্ত ১ লক্ষ লোকের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি ঝ্যাংলো-মার্কিন কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেয়। মার্কিন সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয়। ফলে উভয় পক্ষ

^{১০} George Lenczowski, *Ibid*, p.400

থেকে ছয় জন করে মোট বার জন সদস্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন জার্মানি ও অস্ত্রিয়ার ইহুদি উদ্বাস্ত শিবিরগুলি পরিদর্শন করে এবং ফিলিস্তিন সফর করে। ১৯৪৬ সালের ২০ এপ্রিল কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে তার রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ করা হয় - ১. যতদিন পর্যন্ত না জাতিসংঘের অছি পরিষদের অধীনে ট্রিটিশপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে ততদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যানেজেরি শাসন চালু রাখার সুপারিশ করা হয়। ২. নাথসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী নিয়াতলের শিকার ১ লক্ষ ইহুদিকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ৩. ১৯৩৯ সালের শেতপত্রে জমি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়ার সুপারিশ করা হয়।

কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের উপায় উদ্ভাবনের জন্য দুই দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে আরেকটি কমিশন গঠিত হয়। ব্রিটিশ উপ-প্রধানমন্ত্রী হাবার্ট মরিসন এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি প্রেডির নেতৃত্বে গঠিত এ কমিশন প্রেডি-মরিসন কমিশন নামে পরিচিত। কমিশন ফিলিস্তিনে আরব ও ইহুদিদের সমন্বয়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠনের প্রস্তাব করে। ফিলিস্তিনে ইহুদি শরণার্থীদের আগমন আরব ও ইহুদি উভয় সম্প্রদায়ের সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া উচিত বলে কমিশন মত প্রকাশ করে। কমিশনের প্রস্তাবে ইহুদিরা মারাত্কাভাবে ক্ষণ্ড হয়ে উঠে। ক্ষণ্ডতায় আসার পূর্বে ইহুদিদের প্রতি ব্রিটিশ লেবার পার্টির সহানুভূতিশীল মনোভাব ছিল। তাই তারা আশা করেছিল ব্রিটেনের নব গঠিত লেবার পার্টির সরকার ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি সচেষ্ট থাকবে। কিন্তু লেবার পার্টি ক্ষণ্ডতায় আসার পর ফিলিস্তিন বিষয়ক ব্রিটিশ নীতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি। পরবর্তী মন্ত্রী আর্নেস্ট বেভিন তাঁর পূর্বসূরীদের মতো ইহুদিদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে আরব বিষ্ণকে ক্ষুক করতে চাননি। বরং ফিলিস্তিনে অবিলম্বে ১ লক্ষ ইহুদি প্রবেশের অনুমতি সংক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্পানের অনুরোধে তিনি ক্ষুক হন। প্রেডি-মরিসন কমিশনের রিপোর্টের পর ফিলিস্তিনে ইহুদি সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ জুন হাগানা ফিলিস্তিনের ১১ টি সেতু ধ্বংস করে দেয়। ২৯ জুন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইহুদি সংস্থার সদর দপ্তর ঘেরাও করে বেশ কয়েকজন মেতাকে গ্রেফতার করে। ইহুদি বসতিগুলিতে তগুশী চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ২২ জুন ইহুদি সন্ত্রাসবাদী দল ইরণের জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে অবস্থিত ব্রিটিশ সিভিল হেড কোয়ার্টারটি বোমা মেরে উঠিয়ে দেয়। ফলে এখানে কর্মরত শতাধিক ব্রিটিশ, আরব ও ইহুদি নিহত হয়। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাস্তু শহরে বিশ্ব জাইয়নবাদী সংস্থার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মার্কিন জাইয়নবাদীরা ড. ওয়াইজম্যানের ব্রিটিশ ঘেঁষা নীতির সমালোচনা করে এবং ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসন অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায়। ইহুদিদের দ্বারা ব্রিটিশ পুলিশ ফাঁড়িগুলি আক্রান্ত হতে থাকে। ২৭ জানুয়ারি ইহুদিরা একজন ব্রিটিশ

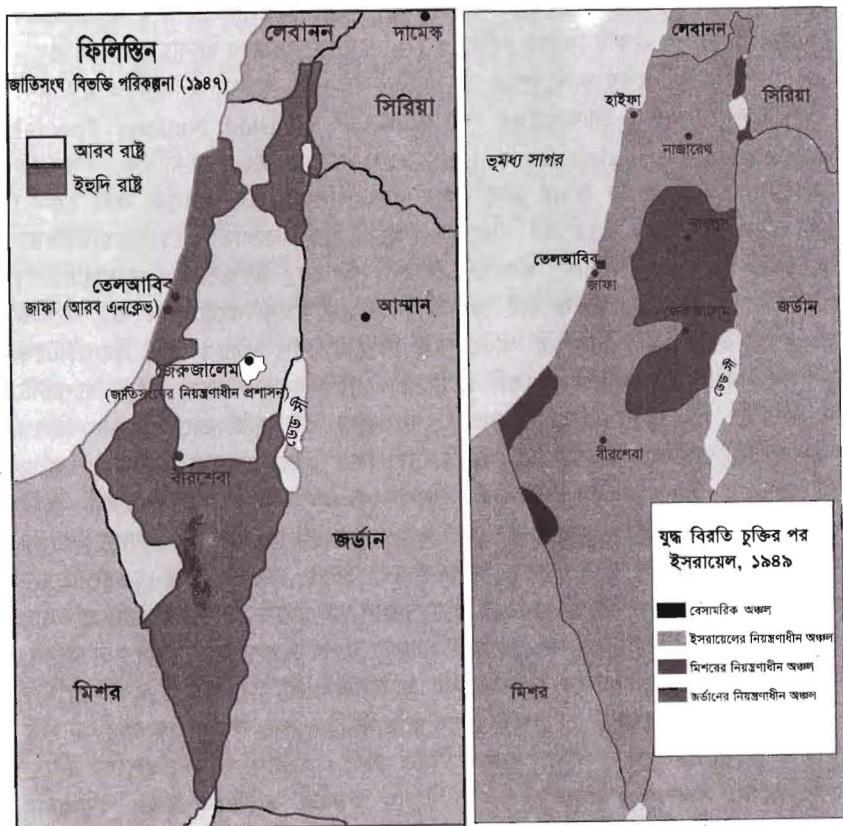
বিচারকসহ অন্য আরেকজন ব্রিটিশ নাগরিককে অপহরণ করে। ব্রিটিশ হাইকমিশনার চরম পত্র দিয়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে বাধ্য করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ফিলিস্তিন ত্যাগে বাধ্য করানোই ছিল এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের উদ্দেশ্য। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার মহিলা ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়। ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীরা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আতঙ্কিত জীবন-যাপন করতে থাকে।

জাতিসংঘের উদ্যোগ

মার্কিন চাপ, ইহুদিদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও আরবদের প্রতিবাদের ফলে ফিলিস্তিন পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের ২ এপ্রিল ব্রিটেন ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানায়। ২৮ এপ্রিল - ১৫ মে পর্যন্ত এ বিশেষ অধিবেশনে সমস্যাটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং “ফিলিস্তিন সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি” (United Nations Special Committee on Palestine – UNSCOP) গঠিত হয়। কমিটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করার জন্য কোন বৃহৎ শক্তিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সুইডেনের নেতৃত্বে ১১ টি দেশের (অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেকোশ্লাভকিয়া, গুয়েতেমালা, ভারত, ইরান, হল্যান্ড, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লাভিয়া) প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটি ফিলিস্তিন সফর করে এবং ৩১ আগস্ট সাধারণ সভার একটি নিয়মিত অধিবেশনে রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু রিপোর্টটিতে কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। তাই রিপোর্টটি সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিকল্পনা এবং সংখ্যালঘু পরিকল্পনা এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিকল্পনায় কানাডা, চেকোশ্লাভকিয়া, গুয়েতেমালা, হল্যান্ড, পেরু, সুইডেন এবং উরুগুয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ফিলিস্তিনকে একটি আরব রাষ্ট্র ও একটি ইহুদি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পক্ষে মত দেয় এবং জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু পরিকল্পনায় ভারত, ইরান এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ আরব ও ইহুদি এলাকার স্বায়ত্ত্বাসন সহ একটি ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। এই পরিকল্পনায় ইহুদি ইমিগ্রেশন সম্পর্কে বলা হয় - তিন জন আরব, তিনজন ইহুদি এবং তিনজন জাতিসংঘের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি ফিলিস্তিনের ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ রেখে আগামী তিন বছর ইহুদি প্রবেশের অনুমতি দিবে। অস্ট্রেলিয়া কোন পক্ষাবলম্বনে বিরত ছিল। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ এডহক কমিটিতে উভয় পরিকল্পনার উপরই বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিকল্পনাটি পাশ হয়ে যায়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় ৩৩ টি রাষ্ট্র, বিপক্ষে ভোট দেয় ১৩ টি রাষ্ট্র এবং ১০ টি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত ছিল। আরবরা অভিযোগ করে যে, পরিকল্পনাটি পাশের জন্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের উপর তার প্রভাবকে কাজে লাগায় এবং যখন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয় তখনই প্রস্তাবটি ভোটের জন্য প্রেরণ করে।^{১৬} প্রস্তাবটি পাশের পূর্বেই ব্রিটেন ১ আগস্ট, ১৯৪৮ এর মধ্যে ফিলিস্তিন হতে ম্যান্ডেটরি শাসন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। ম্যান্ডেটরি শাসন প্রত্যাহারের দুই মাসের মধ্যে যাতে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা যায় সেজন্য সাধারণ পরিষদ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করে এবং এ কমিশনকে সহযোগিতার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করে।

জাতিসংঘ বিভিন্ন পরিকল্পনা (১৯৪৭) অনুযায়ী ইসরায়েল
এবং ১৯৪৯ সালের যুদ্ধ বিরতির পর সম্প্রসারিত ইসরায়েল।



^{১৬} বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য, Michael J. Cohen, *Palestine to Israel: From Mandate to Independence*, London : Frank Cass & Co. Ltd. 1988, pp.206-209

ইরগান, স্টোর্ন গ্যাং সহ কিছু কট্টরপক্ষি ইহুদি গ্রুপ ছাড়া অধিকাংশ ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিকল্পনাটি সমর্থন করে।^{*} কেননা এতে তাদের জন্য একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাৱ কৰা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই আরবরা সংখ্যালঘু পরিকল্পনাটি সমর্থন করে। কেননা এতে একটি অবিভক্ত ফিলিস্তিনের কথা বলা হয়েছে এবং ইহুদি ইম্প্ৰেশন সীমিত কৰাৱ সুপাৰিশ কৰা হয়েছে। এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে রাষ্ট্ৰক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ আৱবদেৱ হাতেই থাকাৰ সম্ভাৱনা ছিল। কেননা ১৯৪৭ সাল পৰ্যন্ত ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার শতকৰা ৬৭ ভাগ ছিল আৱব এবং ৩৩ ভাগ ছিল ইহুদি। আৱবদেৱ বিৱোধিতাৰ আৱেকটি কাৱণ হচ্ছে প্ৰস্তাৱিত আৱব রাষ্ট্রের অন্তৰ্ভুক্ত ভূ-খণ্ড ছিল অনুৰূপ, অধিকাংশ ভূ-খণ্ডই ছিল সমুদ্ৰ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আৱব জনসংখ্যাৰ একটি বৃহৎ অংশ প্ৰস্তাৱিত ইহুদি রাষ্ট্রেৰ সীমানার মধ্যে বসবাস কৰত। পৰিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে তাৱা একটি ইহুদি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু নাগৰিকেৰ মৰ্যাদা নিয়ে বসবাস কৰতে বাধ্য হত। এছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ পৰিকল্পনাটিতে প্ৰস্তাৱিত আৱব রাষ্ট্রকে ফিলিস্তিনেৰ মোট ভূ-খণ্ডেৰ শতকৰা মাত্ৰ ৪৩.৫০ ভাগ, (জেরুজালেম ব্যতিত যাব আয়তন ৪,৫০০ বৰ্গমাইল) প্ৰদানেৰ সুপাৰিশ কৰা হয়। পক্ষান্তৰে, প্ৰস্তাৱিত ইহুদি রাষ্ট্রকে শতকৰা ৫৬.৪৭ ভাগ, (জেরুজালেম ব্যতিত যাব আয়তন ৫,৫০০ বৰ্গমাইল) প্ৰদানেৰ সুপাৰিশ কৰা হয়। প্ৰস্তাৱিত আৱব ও ইহুদি রাষ্ট্রে বসবাসৱত জনসংখ্যা ছিল নিম্নৰূপ :^{১৭}

জাতিসংঘে পাশ্বকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ পৰিকল্পনা অনুযায়ী ফিলিস্তিনে বসবাসৱত জনসংখ্যা

অঞ্চল	আৱব জনসংখ্যা	% আৱব	ইহুদি জনসংখ্যা	% ইহুদি	মোট জনসংখ্যা
আৱব রাষ্ট্র	৭,২৫,০০০	৯৯%	১০,০০০	১%	৭,৩৫,০০০
ইহুদি রাষ্ট্র	৪,০৭,০০০	৪৫%	৪,৯৮,০০০	৫৫%	৯,০৫,০০০
আন্ত জৰুতিক	১,০৫,০০০	৫১%	১,০০,০০০	৪৯%	২,০৫,০০০
মোট	১২,৩৭,০০০	৬৭%	৬,০৮,০০০	৩৩%	১৮,৪৫,০০০

আৱবদেৱ প্ৰতিক্ৰিয়া ও এ্যাংলো-মার্কিন মনোভাব

পৰিকল্পনাটি পাশেৱ পৰ পৱেই আৱবৱা ফিলিস্তিন বিভিন্নিৰ বিৱুন্দে কঠোৱ হৃশিয়াৰি উচ্চারণ কৰে। তাৱা জাতিসংঘ কৰ্তৃক গৃহীত প্ৰস্তাৱটিৰ আইনগত বৈধতা নিয়ে প্ৰশ্ন তোলে। তাদেৱ মতে জাতিসংঘেৰ সনদ অনুযায়ী সাধাৱণ পৰিষদ কেবল সুপাৰিশ কৰতে পাৱে কোন সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলকভাৱে চাপিয়ে দিতে পাৱে না। তাৱা ফিলিস্তিনে তিন দিনেৰ ধৰ্মঘট আহ্বান কৰে। অন্যদিকে ইহুদি সামৱিক ও আধা-সামৱিক দলগুলি

* তাৱা সমগ্ৰ ফিলিস্তিন নিয়ে ইহুদি রাষ্ট্রে পক্ষপাতী ছিল।

^{১৭} Report of UNSCOP – 1947. Available at <http://www.mideastweb.org/unscop1947.htm>

আরব বসতিগুলির উপর আক্রমণ করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে। ফিলিস্তিনী আরবদেরকে রক্ষার জন্য পূর্ববর্তী আরব দেশগুলো হতে বেশ কিছু আরব স্বেচ্ছাসেবী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। ফলে সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র হতে তীব্র আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি ব্রিটেন ঘোষণা দেয় যে, যেহেতু আরব ও ইহুদিরা পরিকল্পনাটির ব্যাপারে একমত পোষণ করেনি সেহেতু পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে তারা জাতিসংঘকে সহযোগিতা করবে না। ব্রিটেন তার পূর্ব ঘোষিত ১ আগস্টের বদলে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে-এর মধ্যে ফিলিস্তিন হতে ম্যান্ডেটরি শাসন প্রত্যাহার করে নেয়ার ঘোষণা দেয় এবং এর পূর্বে জাতিসংঘ কমিশনকে ফিলিস্তিনে প্রবেশ না করার কথা বলে।

আরবদের বিরোধিতা মার্কিন নীতিতেও পরিবর্তন আনে। ১৯ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে ঘোষণা করে যেহেতু ফিলিস্তিনে বিভক্তির পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না সেহেতু ফিলিস্তিনকে আপাতত জাতিসংঘের অছি পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হোক। ইহুদিরা যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। ১৯৪৮ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আরেকটি বিশেষ অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবটির উপর আলোচনা হয় এবং তা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ববর্তী পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়।

ম্যান্ডেটরি শাসনের অবসান ও ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

এমতাবস্থায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে কোন পক্ষের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ না করে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি শাসনের অবসান ঘোষণা করে। সেদিনই তেল আবিবস্থ ইহুদিদের জাতীয় পরিষদ ‘ইসরায়েল’ নামে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। ডেভিড বেন গুরিয়ন প্রধানমন্ত্রী এবং ড. ওয়াইজম্যান নবগঠিত রাষ্ট্রটির প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। এর কয়েক ঘণ্টা পরই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঐ দিনই মিশ্র, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান ও ইরাক তিনি দিক থেকে ইসরায়েলকে আক্রমণ করে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আরবরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও পরবর্তীতে ইসরায়েল প্রতিটি রণাঙ্গনে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। তারা আরব রাষ্ট্রগুলোর আক্রমণ থেকে শুধু ইসরায়েলকে রক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং প্রস্তাবিত আরব রাষ্ট্রের বেশকিছু ভূখণ্ডে নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। ১৯৪৯ সালে ইসরায়েল আক্রমণকারী আরব দেশগুলোর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে যুদ্ধবিহীন চুক্তি স্বাক্ষর করে। যুদ্ধ বিরতির পর দেখা গেল ফিলিস্তিনের মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৭০ ভাগ ইসরায়েলের দখলে রয়েছে যা জাতিসংঘের বিভক্তি পরিকল্পনায় ইসরায়েলের জন্য বরাদ্বৃক্ত ভূ-খণ্ডের চেয়েও শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেশি।

ফিলিস্তিন সমস্যার শিকড়

ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম-এই তিনটি ধর্মেরই পবিত্র স্থান হওয়ায় এসব ধর্মাবলম্বীদের নিকট ফিলিস্তিনের একটি আলাদা মর্যাদা রয়েছে। ইহুদিদের ধর্মহস্তে রয়েছে, ঈশ্বর স্বয়ং পথ দেখিয়ে আব্রাহামকে ফিলিস্তিনে নিয়ে এসেছেন এবং ফিলিস্তিনকে আব্রাহামের বংশধরদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এরপর থেকেই ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে পরমেশ্বরের দান মনে করে এক মহাপুণ্যস্থান হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। এছাড়া ফিলিস্তিনে ইহুদি রাজা সলোমন কর্তৃক ধর্মন্দির নির্মাণ ও যুগে যুগে বহু ইহুদি মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে ফিলিস্তিন ইহুদিদের নিকট ধর্মায়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র স্থানে পরিণত হয়েছে। যীশু খ্রিস্টের জন্মস্থান হিসেবে খ্রিস্টানরাও ফিলিস্তিনকে পবিত্র বলে জ্ঞান করে। পবিত্র আল-আকসা মসজিদের অবস্থান ও হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মেরাজ গমনের স্থান হিসেবে মুসলমানদের নিকটও ফিলিস্তিনের ধর্মায় গুরুত্ব অপরিসীম। এদের সকলেরই ফিলিস্তিন শাসনের ইতিহাস রয়েছে। বসবাসের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হলেও ফিলিস্তিন খুব কম সময়ই ইহুদিদের শাসনাধীনে ছিল। তারচেয়েও কম সময় ছিল বহিরাগত খ্রিস্টান ক্রসেডারদের দখলে। সেই তুলনায় মুসলমান আরবদের ফিলিস্তিন নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ক্রসেডারদের কাছ থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের কৃতিত্বও তাদের। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত শাসকরা ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করে। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে চূড়ান্ত বিতাড়নের কাজটি সম্পূর্ণ হয়। ইতোমধ্যে এই অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। সগুং শতাব্দীতে ফিলিস্তিন বিজয়ের পর আরবিয় উপনীপ থেকে মুসলমান আরবরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। স্থানীয় ক্যানানাইটদের সঙ্গে আরবদের নৃতাত্ত্বিক মিশ্রণ ঘটে এবং ক্যানানাইটরা ইসলাম ধর্ম, আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এভাবেই এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী ক্যানানাইটদের আরবিয়করণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণের ফলে ফিলিস্তিনের খ্রিস্টানদেরও আরবিয়করণ ঘটে। উভয় ধর্মাবলম্বীরা মিলেমিশে ফিলিস্তিনে একটি আরব সমাজ প্রতিষ্ঠা করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিতাড়িত ইহুদিরা সংঘবদ্ধভাবে ফিলিস্তিনে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে কর্মতৎপরতা চালাতে থাকে। তারা ফিলিস্তিনের উপর তাদের ধর্মায় ও ঐতিহাসিক দাবি উত্থাপন করে। ফলে ফিলিস্তিন সমস্যার সূত্রপাত হয়। কেননা ফিলিস্তিনের উপর আরবদের দাবির ভিত্তিও ধর্মায় ও ঐতিহাসিক। কিন্তু ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে উভয়

পক্ষের দাবিসমূহ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়নি। বাস্তবে তা সম্ভবও নয়। কেননা ধর্মীয় পরিভ্রাতার মাত্রা নিরূপণ করা সহজ নয়। বসবাস ও দখলদারিত্বের দিক থেকে আরবরা এগিয়ে থাকলেও শুধুমাত্র এর উপর ভিত্তি করে ইহুদিদের দাবিকে পুরোপুরি নাকচ করা যায় না। অন্যদিকে, কোন স্থান থেকে বিতাড়িত হওয়ার প্রায় দুই হাজার বছর পর পুনরায় সেই স্থানের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি বিশ্ব ইতিহাসে একটি নজির বিহীন ঘটনা। ফলে অভিনব এই সমস্যাটি সমাধানে বিশ্বেতাদের সামনে কোন অনুকরণীয় দ্রষ্টান্ত ছিল না। তাই যে পক্ষ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী তথা বৃহৎ শক্তিসমূহকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে, সে পক্ষই সফল হয়েছে। এদিক থেকে ইহুদিরা ছিল আরবদের চেয়ে অনেক বেশি সফল। উভয় পক্ষ কর্তৃক সমগ্র ফিলিস্তিনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি সমস্যাটিকে আরো প্রকট করে তোলে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইহুদিরা জাতিসংঘের বিভক্তি প্রস্তাব মেনে নিলেও আরবরা অখণ্ড ফিলিস্তিনের দাবিতে অনড় থাকে। তাদের এই অনড় অবস্থান পরিণামে তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছিল। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা না করে ইসরায়েলকে আক্রমণ করতে গিয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভূ-খণ্টুকুও তাদেরকে হারাতে হয়েছে। এই ভূ-খণ্টুকুই উদ্ধারের জন্য তারা আবার যুদ্ধে লিঙ্গ হয়েছে। আর প্রতিটি আরব-ইসরাইল যুদ্ধেই কিছু না কিছু ভূ-খণ্ড আরবদের হাতছাড়া হয়েছে। ফলে নতুন করে হারানো ভূ-খণ্ডের জন্য তাদেরকে নিরঙ্গুর লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে ফিলিস্তিন সমস্যাটি জিইয়ে রাখার সবচেয়ে বড় দায়ভার হচ্ছে ইসরায়েলের। কেননা সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধানের বদলে ইসরায়েল সব সময়ই সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়েছে।